ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ।। ৮ ফাল্গুন, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ।। Website : www.eswastika.com

জনজোয়ারেই নবজাগরণ

বিজেপি'র নবজাগরণ রথযাত্রা উপলক্ষে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতার শহীদ মিনারে তারকাখচিত সমাপ্তি সমাবেশে বক্তব্যরত লালকৃষ্ণ আদবানী। পাশে কলরাজ মিশ্র, বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া, অনন্ত কুমার, অরুণ জেটলি, নীতিন গডকরি, রাহুল সিন্‌হা, রমেশ পোখরিয়াল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। (খবর ভেতরে) ছবি : বাসুদেব পাল

ভোটের নামে রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে দু'দলই

গুরুপুরুষ।। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের নামে রাজ্যজুড়ে হিংসা ও সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে সি পি এম এবং তৃণমূল কংগ্রেস। এই দুই দলই সাম্প্রতিক মৃত্যু মিছিলের জন্য সমানভাবে অপরাধী। সি পি এম জনসভা করলে সেই

একই মাঠে তৃণমূলও পাল্লা দিয়ে জনসভা করছে। এই দু'দলের নেতৃত্বই নির্বাচনে 'অল আউট' যাওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। 'অল আউট' কথাটির রাজনৈতিক অর্থ সকলেই জানেন। অর্থাৎ ভোটে জিততে প্রয়োজনে হিংসার আশ্রয় নিতে দুই প্রধান দল প্রস্তুত। বাংলার মানুষের দুর্ভাগ্য যে ক্ষমতাসীন বামপন্থীদের মতোই প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসও লুম্পেন রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সাধারণ মানুষের কল্যাণ নয়। নেতা-নেত্রীদের ক্ষমতা দখলের লোভই একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে তাই মানুষের লাশের পাহাড় ডিঙিয়ে যেতেও আপত্তি নেই। হিংসার জবাবে প্রতিহিংসা। হ্যাঁ, এখন এটাই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি। স্বয়ং দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস. ওয়াই. কুরেশি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে হিংসাত্মক ঘটনার কথা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করতে হবে। বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে দানব ও অসুরের ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে সে অসহায় বলির পশু। সোজাসাপটা বলতে পারে না যে আমরা বুদ্ধবাবু বা মমতা কাউকেই মহাকরণে দেখতে চাই না। তোমরা দুজনেই সমান ক্ষমতা লোভী অশুভ শক্তি।

ব্রিগেডে জনসভা করে সিপিএম রাজনৈতিক শক্তি দেখালেও তাতে লাভ নেই। নিশ্চিতভাবেই আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে বামপন্থীদের বিদায় ঘণ্টা বাজবে। তবে সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করেই মহাকরণ ছাড়বে।

(এরপর ৪ পাতায়)

প্রধানমন্ত্রীকে আর এস এসের চিঠি

সঙ্ঘকে বদনামের জন্যই তদন্তকে বিপথে চালিত করা হচ্ছে

গত একবছরের বেশী সময় ধরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদেরকে নানা মামলায় জড়ানো হচ্ছে। মাঝে মাঝেই তদন্তের সিদ্ধান্তগত অবস্থানও বদল করা হচ্ছে। যদিও সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সদাসর্বদা সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সরকারের দিক থেকে পূর্বধারণাবশতঃ সঙ্ঘ বিরোধিতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেজন্য এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন সঙ্ঘের সরকার্যবাহ (সাধারণ সম্পাদক) সুরেশ (ভাইয়াজী) যোশী। চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ—

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংজী,

সাদর নমস্কার। এই চিঠির গুরুত্বের কারণে আপনার ব্যস্ততম সময়ের কিছুটা চাইতে বাধ্য হচ্ছি। এই পত্রলেখার কারণ হলো— মালেগাঁও, আজমীর এবং হায়দরাবাদের বিস্ফোরণ-এর বর্তমান তদন্তের গতি-প্রকৃতি জেনে বুঝে বিপথে চালিত করা হচ্ছে। এই নিশা বদল এবং তদন্তের রাজনীতিকরণ করার প্রচেষ্টার বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই চিঠির লক্ষ্য। এভাবেই জেনে-শুনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবিষয়ে একটি মাত্র সত্যই সম্পূর্ণ মিথ্যার মুখোশ খুলে দিতে পারে। মহারাষ্ট্রের পুলিশের সন্ত্রাস বিরোধী শাখার কাছেই পাকাপোক্ত প্রমাণ রয়েছে যে, মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী কর্ণেল পুরোহিত এবং দয়ানন্দ পাণ্ডে চক্রান্ত সফল করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের তৎকালীন সরকার্যবাহ (সাধারণ সম্পাদক) এবং বর্তমানে সঙ্ঘপ্রধান মোহনরাও ভাগবত

মনমোহন সিং

ভাইয়াজী যোশী

এবং সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ইন্দ্রেশকুমারকে প্রাণে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছিল। ওই সময়েই মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাস দমন শাখার এক বরিষ্ঠ অফিসারই সঙ্ঘের এক প্রমুখ কার্যকর্তাকে ওই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে জানিয়ে ছিলেন। এসকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে তা কেউই গুরুত্ব সহকারে দেখছেন না। উল্টে যারা সঙ্ঘের কার্যকর্তাদেরকেই মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের সঙ্গেই সঙ্ঘ-কার্যকর্তাদের একাসনে বসিয়ে অপরাধী প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে কেন ওদের সঙ্গে এক করে ফেলা হচ্ছে?

২০ জানুয়ারি, ২০০৯ মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলা সম্পর্কিত কিছু অডিও সিডির প্রতিলিপি (ট্রান্সক্রিপ্ট) আদালতে চার্জ-শীটের সঙ্গে জমা করা হয়েছিল। ওখানেই বলা হয়েছে, ষড়যন্ত্রকারীরা সঙ্ঘপ্রধানের উপর কেমিক্যাল-হামলা করার পরিকল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রেশকুমারকে মারার জন্য এক ব্যক্তিকে একটি পিস্তলও দিয়েছিল। সি ডি থেকেই স্পষ্ট যে, চক্রান্তকারীরা সঙ্ঘ এবং বিজেপি'র বিরুদ্ধে লাগাতার 'বিষ উগরে' দিয়েছে। আদালতের বাইরে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে (এক্সট্রা জুডিসিয়াল কনফেসন) এটা প্রমাণিত হয় যে, মালেগাঁও-মামলায় প্রধান অভিযুক্তদের নিশানায় সঙ্ঘও ছিল।

সেনা-গোয়েন্দাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে (দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-২৮ জানুয়ারি, ২০১১) প্রকাশিত হয়েছে যে, কর্ণেল পুরোহিত স্বীকার করেছে যে, দয়ানন্দ পাণ্ডের নির্দেশে সে ইন্দ্রেশকুমারকে প্রাণে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। কারণ, কর্ণেল পুরোহিতের সন্দেহ ছিল ইন্দ্রেশকুমার আই এস আই-এর

(এরপর ৪ পাতায়)

শাসক দলের বঞ্চনার ক্ষোভেই দার্জিলিং আজ অগ্নিগর্ভ

নিশাকর সোম

শান্ত সৌম্য হিমালয়ের পাদদেশে অশান্তির আগুন জ্বলছে। দার্জিলিঙের পাহাড়ে সমস্যা এক জটিল পরিস্থিতির আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সিমবুচু-তে গুরুং-এর মোর্চার সভা ভাঙাকে কেন্দ্র করে এক ভয়াবহ অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। গুলি চালনায় ৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। একজন মহিলা-পুলিশকে কুকরী দিয়ে গুরুতর ভাবে আহত করা হয়েছে। এই হাঙ্গামাতে দেশি-বিদেশির অপশক্তির হাত আছে বলে নানা পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে।

দার্জিলিং-এর পাহাড়ী সমস্যা ১৯৫৭ সাল থেকেই দেখা গেছে। একটু পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটতে হচ্ছে। ১৯৫১ সালে স্তালিনের পৃষ্ঠপোষকতায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে জাতি-সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কথাটি লিপিবদ্ধ করা হয়। এ সম্পর্কে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি নেতা সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার বলেছিলেন, ''পাহাড়ি জনগণের দাবিকে সম্মান না করা হলে একদিন এই সমস্যা বিরাট অগ্নুৎপাত ঘটাবে।''

এরপর ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবি করার সময়েও গোর্খালি-ভাষার ভিত্তিতে পৃথক রাজ্য-এর দাবি ওঠে। সিপিএম গঠিত হবার পর ন্যাশন্যাল ইন্টিগ্রেশন কমিটির নিকট সিপিএম-এর

তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরাইয়া দেশের অখণ্ডতা বজায় রেখে দার্জিলিং-এর পাহাড়িদের সমস্যা সমাধানের জন্য বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেছিলেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, দার্জিলিং জেলার সমতল বনাম পাহাড়িদের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। এই দ্বন্দ্ব কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও ছিল এবং আজও আছে।

সিপিএম পার্টির মধ্যেও এ-সমস্যা ছিল এবং আছে। এ-ছাড়া দার্জিলিং জেলায় হাতিঘিষা অঞ্চলে ঈশ্বর তিরকির (কংগ্রেস নেতা) জমি দখল নিয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রপাত। পাহাড়ি অঞ্চলের বহু নেতা-কর্মী এতে জড়িয়ে পড়েন। জড়িয়ে পড়েন জঙ্গল সাঁওতাল-এর মতো নেতা। এরপর থেকে কার্যত পাহাড়-অঞ্চলের সিপিএম-কর্মীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, পাহাড়ে সিপিএম-এর ভাঙন হয়। দার্জিলিং-এর সিপিএম নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণ-এর কলকাতায় সরকারি আবাসনে আশ্রয় নিয়ে ইতিপূর্বে কানু সান্যাল, সৌরিন বসু-এর মতো নেতারা নকশাল আন্দোলনের নেতা হয়ে যান। সমস্যার সমাধান না-করে সিপিএম নেতৃত্ব চুপচাপ থেকে এই সমস্যা বাড়তে দেন।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পরও দার্জিলিং-সমস্যা সমাধানের কোনও চেষ্টা হয়নি। তখন পার্টি থেকে দার্জিলিং জেলার পার্টি সংগঠন-এর দায়িত্ব দেওয়া হয় জ্যোতি বসুর হাতে।

ক্ষোভের রোষে ছাই মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তল।

জ্যোতিবাবু কিছুই দেখতেন না— ফলে সমস্যা বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে সুবাস ঘিসিং-কে সিপিএম তোষামোদ করতে থাকে। ফলে ঘিসিং-ফেঁপে ফুলে উঠলো। ঘিসিং নাকি গোপনে নেপাল-দার্জিলিং নিয়ে এক 'স্বতন্ত্র-রাষ্ট্র' গঠনের আলোচনা করতে থাকেন। তখন থেকেই কার্যত মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যই দার্জিলিং-এর দেখাশোনা করতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অশোক ভট্টাচার্যকে দার্জিলিং-এ নাকি অশোক আগরওয়াল বলে অভিহিত করা হয়! দার্জিলিং-এর চা-শ্রমিকদের কাছে সিপিএম মালিকঘেঁষা বলে পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

এত কথা লেখার কারণ হলো সিপিএম-এর নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তার ফলেই আজ দার্জিলিং সমস্যা। জ্যোতি বসুর মতোই বুদ্ধদেববাবুও অশোক ভট্টাচার্য মারফত তদারকি চালিয়ে দার্জিলিং-এর ''পার্টির দায়িত্ব'' পালন করে গেলেন।

মোর্চার বর্তমানের জঙ্গি হাঙ্গামার পিছনে মাওবাদীদের হাত আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। এদিকে এই জঙ্গি হাঙ্গামা বন্ধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সৈন্যবাহিনী অথবা কেন্দ্রীয় বাহিনী দেবে না বলেই জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারকে বলেছে প্রয়োজনে জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী তুলে দার্জিলিং-এ পাঠানো হোক। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার তথা বুদ্ধদেববাবুকে একেবারে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পুষে রাখা সমস্যা আজ এক মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। বিগত তিন দশকের বেশি সময়ে পাহাড়ি অঞ্চলে কোনও সমস্যা অথবা উন্নয়ন করেনি বামফ্রন্ট সরকার। তার ফলেই অসন্তোষ এবং ক্ষোভ-ক্রোধ জন্ম নিয়েছে।

বস্তুত দার্জিলিং-এর পাহাড় অঞ্চলে বর্তমানে কোনও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেই। ঘিসিংও দার্জিলিং-এ এ-রকম পরিস্থিতি করেছিলেন। তখন থেকে রাজ্য সরকার তথা সিপিএম-এর রাজ্য-নেতৃত্ব কোনও শিক্ষা নেয়নি।

কেন্দ্রীয় সরকার এমন প্যাঁচ কষেছে যার ফলে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে প্রকটিত করে দিতে চায়। প্রমাণ করে দিতে চায়— এ সরকার কোনও সমস্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। এটা অত্যন্ত নির্মম ঘটনা যে, পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ, কাজেই তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত।

ইতিমধ্যে আবার মহাকরণ থেকে ফাইল লোপাটের খবর প্রকাশিত হচ্ছে, তথ্য দপ্তরের ছয়জন কর্মীর পদোন্নতির ফাইল নিখোঁজ হয়ে গেছে। বুদ্ধবাবুদের অপদার্থতা প্রমাণিত। এদিকে আবার সুপ্রিম কোর্ট-এ রাজ্য মন্ত্রিসভার আটজন মন্ত্রীর নামে কালো-টাকা এবং সুইসব্যাঙ্ক-এর অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। বিধানসভা নির্বাচনে এই ঘটনা অবশ্যই প্রভাব ফেলবে। সিপিএম-এর বিদায়ের ঘন্টা বাজতে আরম্ভ করেছে— দেওয়ালেও লিখন বলছে বিদায় সিপিএম—বিদায় বামফ্রন্ট সরকার।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আর এস এস-কে কলঙ্কিত করিবার অপপ্রয়াস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সোজাসাপ্টাই জানাইয়া দিয়াছে যে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে অভিযুক্ত তথাকথিত গৈরিকে বিশ্বাসীরা শুধু জাতির শত্রু নয়, সংগঠনেরও বিরোধী। সংগঠনের কোনও অনুশাসনহীন সদস্য যদি কোনও সন্দেহজনক কাজকর্মে জড়িত থাকে আর এস এস তাহার জন্য দায়ী নয়। বস্তুত সংগঠন হিসাবে এই ধরনের কাজকর্মকে সঙ্ঘ না দিয়েছে কখনও অনুমোদন, না দিয়েছে কখনও মদত। বিশেষত, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সঙ্ঘ যখন বরাবরই সোচ্চার। ঘটনা হইল, অভিযুক্তদের অনেকেই অনেক দিন আগেই সঙ্ঘ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। কেননা সঙ্ঘ কোনও রকম হিংসাত্মক কাজ করিবে না বলিয়া প্রত্যাখান করায় তাহারা যারপরনাই হতাশ হইয়াছে। বস্তুত এতদিন ধরিয়া তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের সময় একজনও তাহাদের কাজকর্মে আর এস এসের সমর্থন বা সাহায্যের কথা বলে নাই। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত আর এস এসের সরকার্যবাহ (সাধারণ সম্পাদক) সুরেশ যোশীর (ভাইয়াজী) একটি চিঠিতে এইসব লোকেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানানো হইয়াছে। ওই চিঠিতে সঙ্ঘ তদন্তের কাজে সরকারকে সম্পূর্ণ সাহায্য করিবে বলিয়া জানানো হইয়াছে। বস্তুত ইতিপূর্বে দুইজন প্রচারককে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেও দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা আত্মগোপনও করেন নাই। বাস্তব তথ্য হইল, সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের যেমন, সমঝোতা এক্সপ্রেস কিংবা আজমীর শরিফে বিস্ফোরণের ঘটনাগুলির সঙ্গে আর এস এসের যোগসূত্রের সামান্য কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহার পরও আর এস এসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার হইতে বিরোধীদের নিবৃত্ত করা যায় নাই। জেহাদী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিরোধে ব্যর্থতা আড়াল করিতেই তাহারা সঙ্ঘকে নিশানা করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। সঙ্ঘকে নিশানা করিবার পশ্চাতে তাহাদের আরও একটি লক্ষ্য হইল সেইসব মুসলিমদের ক্ষোভ প্রশমিত করা যাহারা ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মনে করে যে উপাসনা পদ্ধতি পৃথক হওয়ার জন্যই তাহারা আর এস এস ও তাহার সহযোগী সংগঠনগুলির আক্রমণের নিশানা। এই ধারণা যে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সচেতন মুসলিমরা এই ধারণাকে আমল দেন না এবং তাহারা জানেন যে এই যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে—ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। বাস্তব হইল, হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে ইহা রাজনৈতিক অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নহে।

আর এস এস-কে কলঙ্কিত করিবার অপপ্রয়াস এই প্রথম নয়। কংগ্রেস আমলে তাহাদের হিংসার শিকার হইয়া আর এস এস তিন তিনবার নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হইয়াছে। কিন্তু এইসব বাধা-বিপত্তি পরিণামে আর এস এসের শক্তিই বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিরোধীদের প্রভাবকে নিষ্প্রভ করিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল সম্প্রতি সঙ্ঘের বিরুদ্ধে যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ চলিতেছে তাহাতে পাকিস্তানের হাতেই অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। যে পাকিস্তান হইল সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় ঘর এবং তাহাদের ভূখণ্ড হইতে ভারতে সন্ত্রাসবাদী হানার বিষয়ে প্রতিকার তো দূরের কথা, আক্ষেপের কোনও লক্ষণ মাত্র দেখায় নাই। আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে আর এস এসের বিরুদ্ধে আদর্শগত বিরোধিতার স্থান আছে— তাই বিষয়টি বোধগম্য এবং বৈধ। কেননা এই দেশে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। আর এস এসের নিজস্ব আদর্শবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি রহিয়াছে। এমনকী কেহ যদি ইহার মধ্যে কোনও দোষত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে তাহাও করিতে পারে। কিন্তু জাতির প্রতি আর এস এসের বিশ্বাসযোগ্যতা লইয়া কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারে না। তাই সমালোচনা এমন স্তরে লইয়া যাওয়া উচিত নয় যাহা শত্রুর হাত মজবুত করে। তাই সমগ্র হিন্দুসমাজের উচিত এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানো। সঙ্ঘের প্রতি হিন্দুসমাজের বিশ্বাস এবং সহযোগিতা হইতে ইহা স্পষ্ট যে এই ধরনের ষড়যন্ত্র করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অগ্রগতি রুদ্ধ করা যাইবে না। সঙ্ঘের পঁচাশি বৎসরের ইতিহাস তাহাই বলিয়া থাকে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

নিজেদের অযোগ্যতা ও কুশাসনের ফলে উদ্ভূত এক শোচনীয় অবস্থার দিক থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শাসক গোষ্ঠী নিত্য-নূতন স্লোগান আবিষ্কার করছেন। যেমন—‘সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ’, ‘সমাজতন্ত্র’, ‘সমবায় চাষ’, ‘স্টেট ট্রেডিং’ ইত্যাদি ইত্যাদি। বক্তব্য এই যে, এ পর্যন্ত দেশে এই সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি বলেই আজ আমাদের এই অবস্থা। যে ভারতবর্ষ যুগযুগান্ত ধরে বিশ্বের খাদ্যভাণ্ডার বলে গণ্য হোত, সেখানে আজ ভয়ানক খাদ্য-সঙ্কট এক দূরারোগ্য ব্যাধির রূপ ধারণ করেছে। এর জন্য খাদ্য সমস্যা সমাধানের এবম্বিধ পরিকল্পনাকারীদের মহৎ অক্ষমতাকে ধন্যবাদ দিতে হয় বৈকি! এখন এই ভয়ানক মূর্খতাপূর্ণ ও আনাড়ীপনা প্রসূত ব্যর্থতার জবাবদিহি এড়িয়ে যাবার জন্য তাঁরা সংযুক্ত সমবায় কৃষির অদ্ভুত ‘দৈবগুণাবলী’র কীর্তন করে চলেছেন—যেন ওই প্রথায় হঠাৎ আপনিই চারিদিকে কৃষির ফলন বৃদ্ধি পাবে।

—আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ

এক দুর্বল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমনমোহন সিং

দেবব্রত চৌধুরী

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিং কথা বলেন নিচু স্বরে, আচার-ব্যবহার সজ্জনের মতো। এটা বলা হয় যে তিনি খুব ভদ্রলোক। তিনি নাকি দুর্নীতির উর্দ্ধে। এসব কথা সত্য কিনা সে সম্বন্ধে মানুষের মনে এখন সন্দেহ জেগেছে। তবে এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তিনি একটি দুর্বল প্রধানমন্ত্রী। সবাই তার মাথায় চাঁটি মেরে নিজের ধান্ধা হাসিল করে নেয়। কেউ তাঁকে গুরুত্ব দেয় না এবং তিনিও কাউকে ঘাঁটাতে সাহস করেন না।

প্রথমেই ধরা যাক কৃষি ও বাণিজ্য মন্ত্রকের ভূমিকা। পেঁয়াজের ফলন কমার তথ্য থাকা সত্ত্বেও কৃষি দপ্তর একেবারে হাত গুটিয়ে বসেছিল। আর বাণিজ্য মন্ত্রক যেটা করতে পারতো— বিদেশ থেকে পেঁয়াজের আমদানির ব্যবস্থা করা, সেটা আদৌ করলেন না। উল্টে গত বছরের উৎপাদন থেকে ১৯ লক্ষ টন রপ্তানি করলো অন্য দেশে। যদি এ বৎসর অন্তত রপ্তানিটা বন্ধ করা যেত তবে দেশের বাজারে দেশবাসীকে ৬০ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনে খেতে হোত না। পেঁয়াজের অগ্নিমূল্য দাম নিয়ে কেলেঙ্কারির সময় কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে কোনও কথা জানানো প্রয়োজনও মনে করেননি। বাণিজ্যমন্ত্রী আনন্দ শর্ম্মাও কিছু করেননি। অবশেষে মজুতদারদের লুঠপাঠ যখন শেষ অঙ্কে এসে পৌঁছলো তখন তিনি শারদ পাওয়ারকে একটি চিঠি লিখে “কিছু একটা করা দরকার যাতে দুঃখ কমে” এই গোছের একটা কথা লিখে দায়িত্ব এড়াতে চাইলেন।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন ‘ইনক্লুসিভ’-এর কথা বলেন তখন মনে হয় তিনি শুধু দুর্বলই নন, এক সাথে কপটও বটে। অর্থনীতিবিদ হিসেবে তিনি জানেন খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বিপদে পড়ে দরিদ্র মানুষেরা। সব ধরনের সব্জির দামই যদি বাড়ে এই গরীব মানুষরা একটি সব্জি বাদ দিয়ে আর একটা কিনবে কি করে, তাদের বাজার খরচ আসবে কোথা থেকে? এদের সেরকম কোনও সঞ্চয় থাকে না। যেটা ভেঙে এই বাড়তি খরচের দায় মেটানো যায়। চড়া সুদে ধার নেওয়া কিংবা খাদ্যে সব্জির পরিমাণ কমানো— এর কোনও একটা এঁদের করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বিলক্ষণ জানেন। জেনেও তিনি চুপ করে থাকেন। কারণ শারদ পাওয়ারকে চটিয়ে দিলে ইউ পি এ সরকার বিপদে পড়বে, প্রধানমন্ত্রীর গদি বিপন্ন হতে পারে, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং একজন ক্ষমতালোভীও বটে।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন ‘ইনক্লুসিভ’-এর কথা বলেন তখন মনে হয় তিনি শুধু দুর্বলই নন, এক সাথে কপটও বটে। অর্থনীতিবিদ হিসেবে তিনি জানেন খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বিপদে পড়ে দরিদ্র মানুষেরা। সব ধরনের সব্জির দামই যদি বাড়ে এই গরীব মানুষরা একটি সব্জি বাদ দিয়ে আর একটা কিনবে কি করে, তাদের বাজার খরচ আসবে কোথা থেকে?

এবার আসি কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারির কথায়। ৫০০০০ কোটি টাকা লক্ষাধিক জওয়ানদের নিরাপত্তা বাহিনী, ১৫০ টি কনডোম ভেণ্ডিং মেসিন, বিদেশীদের মনোরঞ্জনের জন্য দিল্লিতে কিশোরী আমদানি আর অন্যদিকে ভারতের ৭৭ শতাংশ মানুষের আয় দৈনিক ২০ টাকার কম।

কমনওয়েলথ গেমস ভারতে অনুষ্ঠিত করা যাবে কিনা এই নিয়ে যখন সারা বিশ্বে সন্দেহ জাগে তখন প্রধানমন্ত্রী একটু নড়ে চড়ে বসেন— ভারতে কমনওয়েলথ গেমস অরগানাইজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা নেন— অনেক দায়িত্ব থেকে রেহাই দেন। কিন্তু কমনওয়েলথ গেমস কমিটিতেও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন ইউপিএ-র প্রাণ ভোমরা সোনিয়া তনয় রাহুল গান্ধী। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিত। এই দুই যুবনেতা সম্বন্ধে মনমোহন সিং “স্পিক-টি-নট”। কেননা এদের বিরুদ্ধে কিছু বললে যে ‘প্রধানমন্ত্রীর’ পদটি ঘচাং-ঘচ হয়ে যেতে পারে। তাই মনমোহন সিং এদের সম্বন্ধে নিশ্চুপ। কংগ্রেসেরই নেতা মণিশঙ্কর আয়ার বলেছেন, ৩৫ হাজার কোটি টাকা কমনওয়েলথ গেমসের জন্য এই বিশাল খরচা যা অন্য কোনও দেশে এখনও হয়নি। এটা একটা সরকারের পক্ষে লজ্জার বিষয়। ৩৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করে আমাদের ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং দিলে আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় তারা মেডেল আনতে পারত। লজ্জার কথা খেলায় জায়গায় ১৫০ টা ‘কনডোম’ বিক্রীর মেশিন বসানো হয়েছে। মণিশঙ্কর আয়ার (আই পি এ) সরকারকে প্রশ্ন করেন, ওখানে ওরা কি খেলতে আসছে? (স্টেটসম্যান ২৮.৭.১০)।

মণিশঙ্কর আয়ার আরও বলেন, সারা দেশ থেকে হাজার হাজার মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করার জন্য দিল্লিতে আমদানি করা হয়েছে। বিদেশীরা যাতে বিরূপ মনোভাব নিয়ে না যায় তার জন্য দিল্লী থেকে সমস্ত ভিখারীদের তাড়ানো হয়েছে। আয়ার আরও বলেছেন, দলিত জনজাতিদের উন্নয়নের বরাদ্দ টাকা লুণ্ঠন করে কমনওয়েলথ গ্রেমস্ প্রকল্পে খরচ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে তাদের গেমসের নানা প্রকল্পে শ্রমিক হিসাবে খাটিয়ে শোষণ চালিয়েছে ইউ পি এ সরকার। কমনওয়েলথ গেমেসের নামে লুঠপাঠের অভিযোগ কেন্দ্র ও দিল্লী সরকারের বিরুদ্ধে (বর্ত-৪.৮.১০) মনমোহন সিং নির্বিকার— কানে দিয়েছেন তুলো। এবার বলা যাক স্পেকট্রাম কাণ্ডটি। নামী আইনবিদ বলে পরিচিত বর্তমান কেন্দ্রিয় টেলিকম্ মন্ত্রী কপিল সিববল সাংবাদিকদের ডেকে জানিয়েছিলেন আগের টেলিকম মন্ত্রী রাজার দুর্নীতির কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। স্পেকট্রাম কাণ্ডে বড় ধরনের দুর্নীতির নামে প্রতারিত টাকার অঙ্ক অস্বাভাবিক, অবাস্তব। কিন্তু এই মন্তব্যের পরে সুপ্রিম কোর্ট সিববলকে ভর্ৎসনা করে এবং রাজার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এর আগে রাজা সি বি আই-কে জানিয়েছিলেন যে ২-জি স্পেকট্রাম বরাদ্দ বিভিন্ন কোম্পানিকে দেওয়ার আগে নিয়মমত ‘পি এম ও’ অফিসকে জানিয়ে করেছেন। এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে সুপ্রিম কোর্ট প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে হলফনামা জমা দিতে বলে যা ভারতের ইতিহাসে এর আগে কখনও হয়নি। অবশেষে টু-জি স্পেকট্রাম বন্টনে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি মামলায় প্রাক্তন টেলিকম্ মন্ত্রী আন্দিমুথু রাজাকে গ্রেফতার করে সিবিআই। ক্যাগ আগেই জানিয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী অনিয়ম করে বেসরকারী দেশি ও বহুজাতিক টেলিকম্ সংস্থাকে লাইসেন্স পাইয়ে দিয়ে সরকারের বিরাট রাজস্বের ক্ষতি করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে রাজাকে গ্রেফতার করিয়ে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কি হাত ধুয়ে ফেলতে পারবেন? প্রাক্তন মন্ত্রী রাজা ১১২টি সংস্থার মধ্যে ৮৫টিকেই বেআইনিভাবে লাইসেন্স পাইয়ে দিয়েছেন যাদের টেলিকম ব্যবসায় কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না। তাই বিরোধীরা মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্বের কথা বলে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলছে। প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী রাজার হাতে হাতকড়ি পড়া প্রমাণ করে দিল প্রধানমন্ত্রী তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ অথবা দুর্নীতিবাজদের প্রশ্রয় দিয়েছেন যা কোনও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শোভা পায় না। এবার আসা যাক কালো টাকা যা বিদেশে জমা আছে তা দেশে ফিরিয়ে এনে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় হোক। এ সম্বন্ধে ক্যাগ-এর প্রাক্তন কন্ট্রোলর এণ্ড অডিটার জেনারেল শ্রী বি. কে. শুগলির নেতৃত্বে ঢংস্তুন্ত্র ত্মন্দ্বন্দ্বন্দ্বন্দ্বনপ্স ঢংনন্দ্বন্ত্রন্দ্বন্নন্দ্ব নামে এক সংস্থা স্থাপন করেছেন। এই সংস্থায় প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার মিলিন্ডো, শ্রী কৃষ্ণমূর্তি, শ্রী যোগিন্দর সিং প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রয়েছেন। তারা ক্রমাগত প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছেন অসাধু-রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ীদের বিদেশে ব্যাঙ্কে জমা টাকা দেশের উন্নতিকল্পে ফিরিয়ে আনা হোক। কিন্তু এ ব্যাপারে শ্রীমনমোহন সিং নিশ্চুপ, কিন্তু তাদের মতে এই টাকা ফেরত আনতে পারলে ভারতে ২২২ বিলিয়ন ডলারের দেনা শোধ করতে পারবে— দেশের পরিকাঠামোর উন্নতি করতে পারবে, নূতন উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করতে পারবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চোখে কালো পট্টী বেঁধেছেন।

তাই বলতে দ্বিধা নেই, মনমোহন সিং-এর মতো দুর্বল প্রধানমন্ত্রীই দরকার সোনিয়ার নেতৃতের ইউ পি এ সরকারের। এই প্রধানমন্ত্রী করবে পররাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে মার্কিন লেজুড়বৃত্তি আর জাতীয়ক্ষেত্রে মদত দেবে লুঠেরা পুঁজিপতিদের। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করবে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের।

প্রধানমন্ত্রীকে আর এস এসের চিঠি

(১ পাতার পর)

এজেন্ট। পুরোহিত এটাও স্বীকার করেছে যে, ২০০৮-এর জানুয়ারিতে সে পাঁচমারীতে ছিল। তখন দয়ানন্দ পাণ্ডে ইন্দ্রেশকুমারকে মারার জন্য কর্ণেল পুরোহিতকে অস্ত্রের ব্যবস্থা করতে বলেছিল। এরপর কর্ণেল পুরোহিতই ইন্দ্রেশকুমারকে দিল্লীতে হত্যা করার জন্য দয়ানন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অলোককে ভূপাল রেল স্টেশনে একটি ৯ এম এম পিস্তল তুলে দেয়। মহারাষ্ট্র-এর সন্ত্রাস দমন শাখা (এ টি এস) এবং মহারাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ কর্ণেল পুরোহিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়েই ওই স্বীকারোক্তি করেছিল যা পূর্বোল্লিখিত অডিও রেকর্ডিং-এর সঙ্গে যা মিলে যায়। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাস দমন শাখার কাছে সঙ্ঘ নেতাদের প্রাণে মারার চক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য রয়েছে।

এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ মজুত থাকা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্র এ টি এস 'জেনে বুঝে সিদ্ধান্ত' নেয় এবং মুম্বাই হাইকোর্টে ২০১০ জুলাই মাসেই জানিয়ে দেয় যে, 'যতদিন পর্যন্ত না মালেগাঁও-মামলার ট্রায়াল শেষ হচ্ছে ততদিন সঙ্ঘ নেতাদের প্রাণে মেরে ফেলার তথাকথিত ষড়যন্ত্র বিষয়ে কোনওরকম ব্যবস্থা নেওয়ারই দরকার নেই।' মহারাষ্ট্র এ টি এস আদালতে স্পষ্টতই মিথ্যে কথা বলেছিল। তাদের কাছে পুরো তথ্যপ্রমাণ ছিল, আগেই তারা তা স্বীকার করে নিয়েছিল। এমনিতে তো কাউকে প্রাণে মারার ষড়যন্ত্র এক ভয়ঙ্কর বিষয়। একটি আলাদা গুরুতর অপরাধ— যা একটি আলাদা মামলা যার সঙ্গে মালেগাঁও মামলা এবং তৎসংক্রান্ত আদালতের বিচার্য বিষয়ের কোনও সম্বন্ধই নেই। মালেগাঁও মামলার বিচারধীন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্ঘ নেতাদের হত্যার ষড়যন্ত্রের বিষয় যুক্ত করার কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না। আসলে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা থেকে বিরত হওয়ার জন্যই এটা করা হয়েছিল। একথা সবাই জানেন— দেরীতে তদন্তে নামলে অনেক তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়ে যায়। এতকিছু সত্ত্বেও মহারাষ্ট্র এ টি এস এবিষয়ে ২০০৮ সালে বা তারপরেও কোনও এফ আই আর পর্যন্ত দাখিল করেনি। অথচ স্বীকারোক্তি অডিও সিডিতে নথিভুক্ত করার দাবী করেছে। এটা তো প্রাণে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র মাঝপথেই পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত। যার ফলে চমকে গিয়ে এক প্রশ্ন উঠে আসে— তাহলে তদন্ত মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার কারণই কি মালেগাঁও ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে সঙ্ঘকে জড়ানোর চক্রান্ত বিফল হয়ে যাওয়ার ভয়? যেহেতু তদন্ত-প্রক্রিয়া মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার ফলে সরাসরি সঙ্ঘ-বিরোধীদেরই লাভ হয়েছে— যারা সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এক শঠতাপূর্ণ অভিযান প্রথম থেকেই শুরু করে রেখেছিল। এখানেই এই খেলার আসল উদ্দেশ্য বোঝা যায়। আমার কাছে খবর আছে যে, সঙ্ঘনেতাদের প্রাণে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র বিষয়ে গত বছরের শুরুতেই মহারাষ্ট্র বিধানসভায় আলোচনা হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তখন এই যাবতীয় বিষয় মহারাষ্ট্র এ টি এস, মহারাষ্ট্র রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্র সরকারের উপরই ছেড়ে দেওয়া সমীচীন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, মহারাষ্ট্র এ টি এস প্রকোষ্ঠ (সেল) নিজেদের আইনী কর্তব্য পালন থেকে পিছু হঠছে এবং একই সঙ্গে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। দেখেশুনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবিষয়ে আইনী বিশেষজ্ঞদের উপযুক্ত মতামত নিচ্ছে যার ফলে আগামী সময়ে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া সুনিশ্চিত করা যায়।

মালেগাঁও মামলা এবং সঙ্ঘের বিরুদ্ধে রচিত চক্রান্তে কর্ণেল পুরোহিতের নাম সামনে আসায় আমরা খুবই বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সেজন্য সম্পূর্ণ বিষয় সরকারের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। যাতে কর্ণেল পুরোহিতের লিপ্ত থাকার বিষয়ে গভীরভাবে তদন্ত করে এবং আসল সত্য উন্মোচিত হয়। কিন্তু তা যখন হলোই না, তখন আমাদেরকে পরিস্থিতিগত প্রমাণ সামনে নিয়ে আসতে হচ্ছে। যা থেকে প্রতীত হচ্ছে যে, কর্ণেল পুরোহিত পুরো বিষয়ে রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের এক চরিত্র (মোহরা) মাত্র। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, কর্ণেল পুরোহিত কীরকম রহস্যময় উপায়ে সঙ্ঘ এবং অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের মধ্যে পরস্পর বিভেদের প্রাচীর তৈরি করার প্রয়াস করেছিল। ২০০৫ থেকেই নিজ ব্যবহার কুশলতা এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বরিষ্ঠ সঙ্ঘ-নেতাদের কাছে আসার চেষ্টা শুরু করেছিল। সে বলেছিল যে, তার কাছে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে যা অন্য কারও কাছেই নেই। সে এবং তার সহকারীরা অপপ্রচার করতে থাকে যে, ইন্দ্রেশকুমার আই এস আই-এর এজেন্ট এবং বিজেপি'র শীর্ষস্থানীয় নেতারা সঙ্ঘের সহযোগী নেতাদের ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করছে। সঙ্ঘের নেতাদের একথা বুঝতে কিছু সময় লেগেছিল যে, প্রকৃতপক্ষে কর্ণেল পুরোহিত এবং তার সহকারীরা সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘের সহযোগী অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে সংগঠনকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা করছে।

আমার স্পষ্ট কথাও হলো, কর্ণেল পুরোহিতের ভূমিকা ছিল রাজনৈতিক এবং সে নিজের বিবেক-বুদ্ধিতে কাজ করত না। সঙ্ঘ এবং তার সহযোগী সংগঠনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে বিভেদের দূরত্ব তৈরি করার পিছনে উস্কানি বা ইন্ধন যোগাত কারা— এটা বের করার জন্য কি বিশেষ তদন্তের প্রয়োজন? বাস্তবে এটা এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, শুধুমাত্র ফৌজদারী মামলা নয়। সেজন্য শুধুমাত্র অপরাধের তদন্ত করে এর পর্দাফাঁস করা যাবে না। যেমন, মালেগাঁও মামলার যে সকল প্রমাণাদি সামনে এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলাই যায়— কর্ণেল পুরোহিত শুধুমাত্র বিজেপি বিরোধী নন, ঘোরতর সঙ্ঘবিরোধী। এথেকে লুকানো রাজনৈতিক মতলবটা টের পাওয়া যায়। এটা আর বলার দরকার পড়ে না, এই ষড়যন্ত্রের পিছনে যারা রয়েছে, তাদেরই রাজনৈতিক লাভ হচ্ছে। এটা হতে পারে। এক্ষেত্রে তার প্রকৃত রাজনৈতিক এজেণ্ডা এবং তার সঙ্গে কারা সম্পর্কিত, এটা বের করতে ঘটনার গভীরে তদন্ত করতে হবে। একই ধরনের তদন্ত দয়ানন্দ পাণ্ডের বিরুদ্ধেও করা দরকার, কেননা তার গতিবিধিও রহস্যময়। তা না হলে সম্পূর্ণ সত্য কখনই বের হবে না।

সরকার এই সব তথ্য বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবগত যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনির্মাণের কাজ করে চলেছে। দূর-দূরান্তে প্রত্যন্ত এবং অনুন্নত পিছিয়ে পড়া এলাকায় দরিদ্র অভাবগ্রস্তদের জন্য অনেকরকম উন্নয়নমুখী সেবা কাজ স্বয়ংসেবকরা চালিয়ে যাচ্ছেন। একথাও উল্লেখ করা দরকার যে, অতীতে সঙ্ঘকাজকে যতরকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে তা সবই বিফল হয়েছে। দেশের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি সঙ্ঘের কার্যক্রমে যোগ দিয়ে সঙ্ঘকার্যের প্রতি আশীর্বাদ প্রদান করেছেন এবং ভূরি ভূরি প্রশংসা করেছেন। ওই সকল মহান ব্যক্তিদের মধ্যে— ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য বিনোবা ভাবে, আচার্য কৃপালনী, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, ভারতরত্ন ভগবান দাস, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডঃ জাকির হুসেন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, জেনারেল কারিয়াপ্পা প্রমুখ। যদিও পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সঙ্ঘের চূড়ান্ত মতভেদ ছিল তবুও উনি ১৯৬৩'র জানুয়ারিতে গণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে যোগ দিতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশ ও সংবিধানের প্রতি সঙ্ঘের নিষ্ঠা নিঃসন্দিগ্ধ। এই নিষ্ঠার কারণেই সঙ্ঘের এক প্রচারক দেবেন্দ্র গুপ্তার গ্রেপ্তারের পর তার উপর গুরুত্ব দিয়ে ১ মে (২০১০)-র বক্তব্যে আমি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলাম— তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তের স্বার্থে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে। একইসঙ্গে আমি আশা করেছিলাম, তদন্ত ঠিকঠাক এবং সুপথচালিত হোক। এজন্য বিগত কয়েকমাস যাবৎ তদন্তকারী সংস্থাকে আমরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি। কিন্তু সেই সময়ে উপলব্ধি করলাম যে, জেনে বুঝে তদন্ত-সংস্থা আমাদের কার্যকর্তাদের অযথা হয়রান করছে। শুধু অমর্যাদাকর ব্যবহারই নয় চরিত্রহননও করছে। এই তদন্ত কেবলমাত্র তদন্তে সীমাবদ্ধ নেই, উপরন্তু সোজাসুজি সঙ্ঘের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসূচী (এজেণ্ডা) এবং অপপ্রচারের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সঙ্ঘবিরোধী অভিযানের এক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। গত একবছর যাবৎ কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক 'গৈরিক সন্ত্রাস' বলে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এক বিদ্বেষপূর্ণ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। তার ভিত্তিতেই ক্ষমতাসীন দল সঙ্ঘের বিরুদ্ধে তদন্ত করার কথা বলছে। এর থেকেই সঙ্ঘের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সূচী'র বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের, সঙ্ঘের নেতাদের প্রাণে মারার চক্রান্তের বিষয় আপনার গোচরে নিয়ে আসা আমার দায়িত্ব বলে মনে করছি। আমার দাবি, সরকার যেন কর্ণেল পুরোহিত, দয়ানন্দ পাণ্ডে এবং তাদের সহযোগীদের লুকানো আসল এজেণ্ডার ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং যথাযথ নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করে। ক্ষমতাসীন দলের ব্যক্তি ও নেতাদের তো অনেক আগে থেকেই সঙ্ঘের সম্পর্কে বিরুদ্ধ-মনোভাব রয়েছে। আর এসময়ে তদন্তকারী সংস্থা যেভাবে যে পদ্ধতিতে তদন্ত চালাচ্ছে তার ফলে তো সরকারী তদন্ত সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের আগ্রহ হলো তদন্ত সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হোক। আমার আশা সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দেবেন।—

(১) সঙ্ঘ নেতাদের প্রাণে মেরে ফেলার চক্রান্ত।

(২) মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাস দমন প্রকোষ্ঠ (সেল) ওই তদন্ত কেন ধামাচাপা দিল এবং তদন্ত বন্ধ করল।

(৩) কর্ণেল পুরোহিত, দয়ানন্দ পাণ্ডে এবং ডাঃ আর পি সিংহের মতো তাদের অন্য সব সহযোগীদের বাস্তবিক রাজনৈতিক ভূমিকা কি ছিল? ওদের প্রকৃত কর্মসূচী (এজেন্ডা) কি?

(৪) এই অভিযানে তাদের অন্য সহযোগী আর কে কে আছে নিরপেক্ষ তদন্ত ব্যতিরেকে ওইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর এবং পরিপূর্ণ সত্য আদৌ প্রকাশ পাবে না।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি সামাজিক সংগঠন। এজন্য সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত সেবাকাজ ব্যতিরেকে সাধারণত বুঝে শুনেই রাজনৈতিক ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে বিশেষ একটা বার্তালাপ করে না। এজন্য সঙ্ঘের পক্ষে এরকম ঘটনা ক্বচিৎ ঘটেছে— যে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা অথবা চিঠি লেখার ঘটনা ঘটেছে। সেজন্য আপনাকে লেখা আমার প্রথম চিঠিতেই এইসব তথ্য আপনার গোচরে আনার জন্য আমি একরকম বাধ্য হয়েছি, যা আমার নিজেরই নিজের কাছে রুচিকর বোধ হচ্ছে না। একই সঙ্গে পত্রের উল্লিখিত তথ্যাবলী অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। সেজন্য আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পত্র একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু আমার আপনার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে— আপনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ব্যস্ততা সত্ত্বেও এখানে উল্লিখিত তথ্য ও প্রশ্নাবলী বিষয়ে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করে উপযুক্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বিষয়ের গুরুত্বকে মনে রেখেই প্রয়োজন আপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলিত হয়ে উক্ত বিষয়ে সরাসরি আলোচনা করা উচিত। এজন্য আপনার কাছে নিবেদন— দয়া করে আপনার সুবিধা মতো কোনও সময় দিয়ে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা বলার সুযোগ প্রদান করবেন।

ভবদীয়

সুরেশ (ভাইয়া) যোশী

সরকার্যবাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

(মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ)

সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে দু'দলই

(১ পাতার পর)

হিংসাদীর্ণ নৈরাজ্যের ভুলভুলাইয়া থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে বার করার দায়িত্ব নিতে হবে প্রধান বিরোধী জোটকেই। সেই শক্তি ও সাহস আছে তো? তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদা দুর্নীতির অভিযোগে এন. ডি. এ. ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। ভাল কথা। তবে এবার 'টুজি স্পেক্ট্রাম' কেলেঙ্কারীতে জড়িত দ্বিতীয় ইউপিএ জোট সরকারে আছেন কেন? ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারীকে 'মাদার অব অল করাপসন্স' বলা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী ডি এম কে দলের এ. রাজা গ্রেফতার হয়ে জেলে আছে। তদন্তকারী সি বি আই গোয়েন্দাদের বক্তব্য, মন্ত্রীমশাই কমপক্ষে ৩ হাজার কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন। রাজাবাবু তো শিখন্ডী। আড়ালে থাকা রাঘব বোয়ালদের বাঁচাতে নিরপেক্ষ তদন্তে আপত্তি করছে কংগ্রেস। বিরোধীরা যুক্ত সংসদীয় কমিটি গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়েছে। কংগ্রেসের ইউপিএ জোট সরকার রাজি নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল এই জোট সরকারের অন্যতম প্রধান শরিক। অথচ তাঁর বিশেষ হেলদোল নেই। একদা যে নেত্রী অভিযোগ উঠতেই সত্য মিথ্যা যাচাই না করেই দ্রুত পদত্যাগ করে এন ডি এ জোট ছেড়েছিলেন এবার তাঁর মুখে কুলুপ আঁটা। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকা কংগ্রেসের হাত ছাড়তে তিনি নারাজ। তবে কি তিনি এখন আর্থিক দুর্নীতিকে অচ্ছুৎ মনে করেন না?

দুর্নীতি প্রসঙ্গে মমতা কি মনে করেন অথবা মনে করেন না তাতে সারা দেশের জনমতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। সীমাহীন দুর্নীতি, লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও মাওবাদী হিংসা দমনে চরম ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রে দিশাহীন দুর্নীতিপরায়ণ কংগ্রেস জোট সরকারই যে দায়ী সে ব্যাপারে কোনও দ্বিমত নেই। পাঁচটি রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এর প্রতিফলন ঘটবেই। সম্প্রতি বিহারে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এবার পাঁচটি রাজ্যেও হবে। তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস-ডি এম কে জোট হারছে। অসমেও কংগ্রেস যে ডুবতে বসেছে তার প্রমাণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আগাম জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি এবার নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন না। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমকে হঠাতে মমতা জোট করেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসের সঙ্গে। তাই দুর্নীতির দায় তাঁর দলকেও নিতে হবে। তখন বলা চলবে না কংগ্রেস আমাদের ডুবিয়েছে।

অতিথি কলম

আমেরিকা চীনের সঙ্গে সখ্যতা বাড়িয়ে চলেছে

জি পার্থসারথি

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে মার্কিন-সোভিয়েত শীর্ষ বৈঠকে প্রাধান্য পেত অস্ত্র সংবরণ এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রতিযোগিতা। দ্বি-পাক্ষিক আর্থিক সমঝোতা এতে স্থান-ই পেত না। দুই মহাশক্তিধর দেশ বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করার অবকাশই পেত না। মার্কিন-চৈনিক সখ্যতা যখন অর্থনীতি কেন্দ্রিক তখন দুই দেশ আলোকপাত করলো বাণিজ্য, পুঁজিলগ্নী, বাজার দখল এবং মুদ্রাবিনিময় হারের ওপর। বর্তমানে এসব খুবই জরুরী— কারণ পশ্চিমী দেশগুলিতে চলছে আর্থিক সঙ্কট, চীনের সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্যিক ঘাটতি ফুলে-ফেঁপে দাঁড়িয়েছে ২০১০ সালে প্রায় ২৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ও ই সি ডি (OECD) দেশগুলি যে সংকটে ভুগছে তা সমাধানে কোনও সুষ্ঠু নীতি এখনও তৈরি করতে পারেনি।

ওবামা-হু শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল গত ২২ জানুয়ারি যা আসলে পর্যবসিত হলো পারস্পরিক সন্দেহ আর উচ্চাভিলাষী প্রতিযোগিতায়। ২০১০ সালের হিসেব অনুসারে চীনের আর্থিক উন্নতি হয়েছে ১০.৩ শতাংশ হারে। গত কয়েক বছরে উন্নতশীল দেশগুলিতে চীন সাহায্য পাঠিয়েছে ১০০ বিলিয়ন ডলার। এই সাহায্যের মোট পরিমাণ বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহায্য অপেক্ষা অধিক।

অন্যদিকে মার্কিন দেশ আর্থিক সংকটের কবলে। বেকার বেড়ে হয়েছে ১০ শতাংশ। দেশের গড় উৎপাদনের নিরীখে আর্থিক ঘাটতি হার ১০.৬৪ শতাংশ। এছাড়া আফগান, ইরাক যুদ্ধ মার্কিন কোষাগার শূন্য করে দিয়েছে। খবর যে, এই যুদ্ধে শুধু প্রাণ গিয়েছে ৫৯০০ মার্কিন নাগরিকের। এই অসম লড়াইয়ে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছেন সাড়ে ৬৫ হাজার সাধারণ মানুষ। ইরাকেই ৪২ লক্ষ মানুষ গৃহহীন। আফগানিস্থানেও সাড়ে ১৪ হাজার থেকে ৩৪ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। এই লড়াইয়ে মার্কিন মর্যাদা বিশ্বাসযোগ্যতা ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

যদি মার্কিনীদের এই সামরিক অভিযানে ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে অন্যদিকে চীনেরও ঔদ্ধত্য বেড়ে গেছে গত কয়েক বছরে। দেং জিয়াও পিং "hide your strength, bide your time" (নিজের ক্ষমতা জানিও না, সময়টা কাটিয়ে দাও) রণকৌশল নিয়েছেন। বিভিন্ন পরামর্শ উপেক্ষা করে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চীন নিজের পেশী শক্তির প্রদর্শন করেছে। এর ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলি গভীর উদ্বেগ বোধ করছে।

চীন নির্লজ্জভাবে জাপান, ভিয়েতনাম থেকে ইন্দোনেশিয়া মায় ভারত পর্যন্ত দেশগুলির জলসীমা, স্থলসীমা লঙ্ঘন করছে। ২৬।১১-র মুম্বাই হানার পর চীন যুদ্ধের সতর্ক বার্তা দিয়ে রেখেছে এবং অরুণাচল প্রদেশ জবর দখল করারও হুমকি দিয়ে রেখেছে যদি ভারত সন্ত্রাসবাদের স্বর্গকে (পাকিস্তান) আক্রমণ করে। ওবামা প্রশাসনের সঙ্গে সখ্যতা চীনের দুঃসাহসকে আরও শক্তিশালী করবে।

২০০৯ সালের শীর্ষ বৈঠকে ওবামা প্রশাসন তাইওয়ান ও তিব্বতকে চীনের প্রধান লক্ষ্য (কোর ইন্টারেস্ট) বলে চিহ্নিত করলে চীন আরও একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করেছে, সম্পূর্ণ দক্ষিণ চীন সাগর তাদেরই প্রাধান্যভুক্ত অঞ্চল।

সফররত মার্কিন প্যাসিফিক ফ্লীটের কমাণ্ডারকে বলা হলো যে, ভারত মহাসাগর, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর তাদের প্রভাবযুক্ত বলয়। চীন প্রবল বাধা দেয় পীত সাগর এলাকায় মার্কিন-দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়াতে। এমনকী উত্তর কোরিয়ার টর্পেডোর আঘাতে দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি জাহাজ ডুবে যায়। চীন জাপানের সঙ্গে পূর্ব চীন সাগরের সেনকাকু দ্বীপ নিয়ে যে দ্বৈরথ চলছে সেখানেও উস্কানিমূলক আচরণ করেছে।

ওবামাকে ২০০৯ সালের নভেম্বরে মি. হু জিন তাও-র সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে কার্যতঃ নতজানু হতে দেখা যায়। ওবামা চীনের পরামর্শ মতো দালাই লামার সাক্ষাৎ বাতিল করেন, চীনে অবস্থানকালে 'মানবাধিকার' নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। যখন চীনের মনোভাব 'যুদ্ধং দেহি' তখন মার্কিন নীরবতা মার্কিন বন্ধু জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াকে হতাশ হতে দেখা গেছে। মি. হু জিন তাও সিওলে জি-২০ শীর্ষ বৈঠকে মুদ্রা বিনিময়মূল্যসহ অন্যান্য আর্থিক সমস্যায় মার্কিন উদ্বেগকে কোনও আমল-ই দেননি। চীনের এই ঔদ্ধত্যের যোগ্য জবাব দিতে ট্রত্রড্রট্টত্ব ভুক্ত দেশগুলি পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে আমেরিকা, রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানায়। ট্রত্রড্রট্টত্ব শীর্ষ বৈঠক যা হ্যানয়ে সংগঠিত হয়েছে তাতে মার্কিন বিদেশসচিব হিলারি ক্লিন্টন দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে চীনের নীতির বিরোধিতা করেন।

নিজের দেশে যখন ওবামার চীন সংক্রান্ত নীতির বিরোধিতার পারদ চড়ছে, ওয়াশিংটন তখন শীর্ষ বৈঠকে কিছু সার্থক পদক্ষেপ করে। ওবামা ওকালতি করেন "মানবাধিকারের বিশ্বায়ন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে মি. হু জিন তাও-কে স্বীকার করাতে বাধ্য করেছেন যে মানবাধিকার নিয়ে চীনের অনেক কিছু করার আছে। মি. ওবামা তাঁর চীনা অতিথিকে দালাই লামার সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন। চীনকে বলা হয়েছে উত্তর কোরিয়ায় ইউরোনিয়াম পরিশোধনের প্রক্রিয়াকরণকে নিন্দা করতে।

চীনে তার ভারত সফরের সমালোচনা ওঠায় ওবামা বাধ্য হন হু জিন তাও-ওবামা যৌথ বিবৃতি বদলে দিতে। বিলম্ব হলেও আমেরিকা বুঝতে পেরেছে, চীনের পরমাণু ও মিসাইল প্রযুক্তি নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং আফগানিস্তানে তালিবান ক্রিয়াকলাপ নিয়ে চীনের না দেখায় ভান। যাই হোক, আর্থিক ইস্যুতে চীন আমেরিকাকে কোনও ছাড় দেয়নি, বরং মার্কিন কর্পোরেটরদেরকে কার্যতঃ চীন নিজেদের তাঁবুতে বেঁধে রেখেছে। লক্ষ্য করা যায়, চীনের আর্থিক শক্তি, সামরিক শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে আমেরিকা চীনের সঙ্গে সখ্যতা বাড়িয়ে চলেছে। পরিবর্তে চীনও ইরান ও উত্তর কোরিয়ায় পারমাণবিক ক্রিয়াকলাপে নিজেদের ভূমিকা সদর্থক ভাবে আমেরিকার কাছে তুলে ধরেছে। রাশিয়া এই অবস্থায় ফায়দা তুলতে বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে (যেমন আফগান ইস্যুতে) প্রয়োজন মতো আমেরিকাকে লজিস্টিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত। এইসব ঘটনা প্রবাহ আগামীতে শক্তিধর দেশ হিসেবে উঠে আসা ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলি বিশ্বে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে অন্যদের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে সচেষ্ট হবে। জাপান ইতিমধ্যেই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। জাপান-ভারত-মার্কিন যৌথ সামরিক মহড়া হবে এই বছরের শেষ নাগাদ ওকিনাওয়া-র কাছে। ভারত নিরাপত্তার সহযোগিতার বিষয়টি নিয়ে এশিয়া-প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দেশগুলি যথা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনামের সঙ্গে মন্ত্রীস্তরীয় আলোচনা করেছে।

লেখক ঃ পাকিস্তানে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত

চীনের আর্থিক শক্তি, সামরিক শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে আমেরিকা চীনের সঙ্গে সখ্যতা বাড়িয়ে চলেছে। পরিবর্তে চীনও ইরান ও উত্তর কোরিয়ায় পারমাণবিক ক্রিয়াকলাপে নিজেদের ভূমিকা সদর্থক ভাবে আমেরিকার কাছে তুলে ধরেছে। রাশিয়া এই অবস্থায় ফায়দা তুলতে বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে (যেমন আফগান ইস্যুতে) প্রয়োজন মতো আমেরিকাকে লজিস্টিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত।

অ যাচ রকম

দাবাড়ু অনীশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ১৬ বছরের কিশোরটির নাম অনীশ গিরি। জন্মসূত্রে বাবা নেপালী মা রাশিয়ান, তবে অনীশের শেকড় বারাণসীতে। সেখানে থাকেন তার ঠাকুমা। যিনি আদতে বারাণসীরই বাসিন্দা। মাত্র ১৪ বছর ৭ মাস বয়সে দাবার গ্র্যাণ্ডমাস্টার হয়েছিল অনীশ। এটা বছর দেড়েক আগের ঘটনা। আন্তর্জাতিকতায় তাই অনীশ একদিকে যেমন জন্মসূত্রেই পেয়েছিল, তেমনি নিজের যোগ্যতাতেও তাকে অর্জন করতে হয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বিশ্বের আঙিনায় হয়তো সন্ধান মিলবে আরও অনেক অনীশ গিরির, যে দাবাখেলায় তুখোড়, অঙ্কে দারুণ ভাল, প্রিয় টাইম-পাস 'ফেসবুক'। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে কতজন কিশোর দাবাড়ু রয়েছেন যাঁরা দাবা খেলায় রীতিমতো ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন বিশ্বজয়ী বিশ্বনাথন আনন্দকে? উত্তরটা শুনুন অনীশের বাবা সঞ্জয় গিরির মুখ থেকে— "আনন্দের সঙ্গে আমার ছেলে অনীশের মধ্যে একটা গেম হয়। আমি খেলার পর আনন্দের কাছে আমার ছেলের খেলার সম্বন্ধে জানতে চাই। আনন্দ বলেন— আপনার ছেলে অত্যন্ত কৌশলী দাবাড়ু। আমি খুব ভাগ্যবান যে আজ ম্যাচ বাঁচাতে পেরেছি।" এতেই শেষ নয়। অনীশের সম্বন্ধে পরবর্তী চমকপ্রদ তথ্য— মাত্র ১৬ বছরেই দু'টি ভাষা করায়ত্ত করে নিয়েছে সে। অনীশের ডাঃ কোচ ভ্লাদিমির চুচেলভ মনে করছেন বুদ্ধির যে

অনীশ গিরি

কোনও খেলায় এখন 'টার্মিনেটর'-এর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে অনীশ। কথাটা বোধহয় খুব একটা মিথ্যে নয়। দাবার বিদ্যের সঙ্গে নিজের বুদ্ধির মিশেল ঘটিয়ে এমন একটা স্তরে এখনই পৌঁছে গিয়েছে অনীশ যেটা হয়তো অন্য অনেকের পক্ষে কোনওদিনই সম্ভব হওয়া মুশকিল। যেমন ধরা যাক কিশোরদের দাবায় এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ স্থানে থাকা ম্যাগনাস কার্লসেন মাত্র ২২ চালের পরই হার স্বীকার করে নেয় আনন্দের কাছে। সেখানে ৫০ চালের পরও রীতিমতো অটল ছিল অনীশ গিরি। বরং বিশ্বচ্যাম্পিয়ান আনন্দ-ই কিছুটা বিপাকে পড়ে ড্রয়ের প্রস্তাব দেন অনীশের কাছে! ছোট্ট ডাচ্ শহর উইজকান জী-তে আয়োজিত টাটা স্টীল চেজ টুর্নামেন্ট তাই আক্ষরিক অর্থেই সন্ধান পেয়েছিল এক অন্যরকম দাবাড়ুর।

অন্যরকম দাবাড়ু বললে একটু ভুল হবে। অন্যরকম প্রতিভাধর অনীশের জন্ম রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে। ছেলের ছোটবেলা থেকেই ছিল দাবার প্রতি অদম্য টান। অনীশের মা পাঁচ বছরের অনীশকে শিখিয়েছিলেন দাবার কয়েকটি বেসিক মুভ। আর তাই শিখে তারপর মাত্র ১ বছরের মধ্যেই তিন ভাইবোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র অনীশ গুরুমারা বিদ্যেয় হারিয়ে দেয় তার মা-কে। ছেলের প্রতিভা-কে চিনতে ভুল করেননি তার মা। ভর্তি করে দেন ওখানকারই এক দাবা-স্কুলে। তারপর শুধুই রূপকথা। অনীশের সাফল্যের গল্প। 'অন্যরকম' হয়ে ওঠার কাহিনী। পথচলা আজও বাকি।

অগপ ছেড়ে বিজেপিতে সর্বানন্দ সোনোয়াল

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন গডকরি এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় নেতা-নেত্রীদের উপস্থিতিতে ডিব্রুগড়ে এক জনসভায় বিজেপি-তে যোগ দিলেন অসম গণপরিষদের প্রাক্তন সাংসদ সর্বানন্দ সোনোয়াল। গডকরি ছাড়াও

নীতিন গডকরির উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিলেন সর্বানন্দ সোনেয়াল।

উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সহ-সভানেত্রী বিজয়া চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় সম্পাদক ত্রয়ী— বিজয় গোয়েল, তাপির গাও এবং বরুণ গান্ধী, রাজ্য সভাপতি রণজিৎ দত্ত এবং দলের সাংসদ ও বিধায়করা। সর্বানন্দ সোনোয়াল ছাড়াও অন্য যাঁরা ওইদিন বিজেপি'তে যোগ দেন তাদের মধ্যে আছেন আসু'র দুই নেতা— সৈয়দ মইনুল আওয়াল ও পুলক গোহাঞি এবং চা-জনজাতি ছাত্রনেতাদের একটি দল। সঞ্জয় কিসান, রসিক দাস (প্রাক্তন অগপ নেতা), পরিমল কুমার দাস, আমিনুল হক, আয়াজুদ্দিন আহমেদ (উভয়েই শিবসাগর জেলার) এবং আরও অনেক ক'জন।

প্রাক্তন সাংসদ শ্রী সোনোয়াল তাঁর ভাষণে বলেন, তিনি বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন কেননা অসম গণ পরিষদ অসমীয়া ভূমিপুত্রদের স্বার্থরক্ষা করছেনা। অগপ তার প্রতিশ্রুতি ভুলে এক বিভ্রান্তিতে ভুগছে। তিনি আরও বলেন, "অগপ একদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা অসমকে বাংলাদেশীমুক্ত করবে। বর্তমানে ক্ষমতা দখলের লোভে অগপ গড্ডালিকা প্রবাহে গা-ভাসিয়েছে। যে বা যারা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাজনীতি করছে (পড়ুন এ আই ইউ ডি এফ) তাদের সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধছে। রাজ্যের মানুষের সঙ্গে বঞ্চ না ও বেইমানীর পথে তারা গিয়েছে।" তবে শ্রী সোনোয়াল আশাপ্রকাশ করেন যে অগপ'র তৃণমূল স্তরের কর্মীরা তাঁকে সাংসদ বা বিধায়ক হিসেবে লক্ষ্যে অবিচল দেখতে চান। এবং ভারতীয় জনতা পার্টি সেই কাজ করবে যে কাজ দল হিসেবে অগপ করতে পারেনি বা চায়নি।

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত অগপ-তে নতুন করে যোগ দেওয়ার পর অগপ অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় সতত প্রয়াসশীল ধনকুবের বদরুদ্দিন আজমলের দল 'এ আই ইউ ডি এফ'-এর সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গড়তে চলেছে। মহন্তর জন্মদিনে সম্প্রতি বদরুদ্দিন আজমলের সঙ্গে প্রফুল্ল মহন্তর বিস্তারিত আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। অসমের মিডিয়া ব্যাপারটা হাল্কা করে দেখেনি— নাম দিয়েছে 'বার্থ-ডে-পলিটিক্স'।

উল্লেখ্য, সর্বানন্দ সোনোয়াল সাংসদ থাকাকালীন (২০০৩) সুপ্রীম কোর্টে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থরক্ষাকারী কুখ্যাত আইন— আই এম ডি টি নিয়ে মামলা করেছিলেন তা রদ করার জন্য। ওই আইনে অনুপ্রবেশকারীর কোনও দায় ছিল না, অভিযোগকারীকেই প্রমাণ করতে হোত কেউ অনুপ্রবেশকারী কিনা। এছাড়াও অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হোত।

প্রাক্তন এই ছাত্রনেতা এবং সাংসদ আরও জানান, বর্তমানের অসম রাজ্য সরকার রাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশীদের স্বার্থরক্ষা করছে। ভূমিপুত্র অসমীয়াদের স্বার্থরক্ষা করছে না। এছাড়া তিনি সুস্পষ্টভাবে জানান, বিজেপি একটি সর্বভারতীয় ও ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক দল, কোনও সাম্প্রদায়িকতা এই দলে নেই। তিনি বিশ্বাস করেন, অগপ (অসম গণ পরিষদ) অসমের মানুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে সেই ক্ষতি পূরণ করতে পারবে এবং অসমকে একটি প্রথম শ্রেণীর রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরি বলেন, কংগ্রেস শাসনে অসমে একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারী ও ভয়াবহ দুর্নীতি হয়েছে। ক্ষমতায় আসাই তাঁর দলের একমাত্র লক্ষ্য নয়। দেশের করুণ চিত্র পরিবর্তন, দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নই দলের নীতি।

সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় সম্পাদক ও সাংসদ বরুণ গান্ধী, ডিব্রুগড়ের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন, সর্বভারতীয় সহ-সভানেত্রী বিজয়া চক্রবর্তী, তাপির গাও এবং বিজয় গোয়েল প্রমুখ।

মন্দিরের গাছ কাটার চক্রান্ত ভেস্তে গেল মালদায়

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার শহর লাগোয়া যদুপুর গ্রামে শ্রীশ্রী দুর্গামাতার নামে জমি মুসলমানদের কাছে বিক্রি করার এক গোপন চক্রান্ত হিন্দুদের প্রতিরোধে ভেস্তে গেল। গত মাসে যদুপুর গ্রামে এই আম বাগানটির গাছপালা (যেটি দুর্গার নামে রয়েছে সেটি) কাটতে গেলে গ্রামবাসীরা বাধা দেন। উত্তর যদুপুর মৌজার দাগ নং ১১৪৮, জে. এল নং-৮৮ ও খতিয়ান নং-৩২১ নং পরিমাণ এক একর ২২ শতক জমিটি শ্রীশ্রী দুর্গা দেবীর নামে তার সেবাইত তিন জন (১) কৃষ্ণগোপাল সাহা (২) চন্দ্রমোহন মাইতি ও (৩) জহরলাল ভুতরা এতদিন ভোগ করত। এর মধ্যে কৃষ্ণগোপাল ও চন্দ্রমোহন মারা গেছেন। বর্তমানে একমাত্র জীবিত সেবাইত জহরলাল ভুতরা এই জমিটি গোপনে যদুপুরের সামাদ আলী, আতাউর রহমান এবং মালদা শহরের চিত্ত হাজরা ও আরও দুজনের কাছে বিক্রি করেছে বলে শোনা গেছে। জমির দলিলে "এই জমি বিক্রি করা যাবে না" উল্লেখ থাকলেও জহরলাল ভুতরা স্থানীয় গ্রামবাসী হিন্দুদের না জানিয়ে এই জমি বিক্রির মতলব করছিল। ক্রেতারা বন দফতর, মুসলিম অঞ্চ ল প্রধান ও পুলিশের একাংশকে হাত করে দুর্গার নামে এই আম বাগানের গাছ কাটতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা জানতে পেরে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলে এবং গাছ কাটা বন্ধ করে। স্থানীয় জনগণ, জেলা সমাহর্তা, পুলিশ সুপার ও ইংরেজবাজার থানাতে প্রতিবাদ পত্র দেওয়া সত্ত্বেও যদুপুরের মুসলিমরা এই জমি দখলের জন্য বিভূতি মণ্ডলের বাড়ির সামনে বোমা ফাটায় এবং বাগানের মধ্যে অস্থায়ী ভাবে নির্মাণ করা দুর্গা মণ্ডপের সামনে মুরগীর মাংস ও মদ খেয়ে হিন্দুদের ভয় দেখায়। গত ৮ ফেব্রুয়ারি এই প্রতিবেদক ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে, হিন্দুদের দুর্গার জমির চারিদিকের বেড়াটি মুসলিমরা ভেঙে দিয়েছে এবং স্থানীয় হিন্দুরা পুরুষ ও নারী সমবেত ভাবে সেই বেড়ার চরিদিকে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে— মুসলিমরা ও শহরের দুজন হিন্দুকে ক্রেতা তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। গণ্ডগোলের এই খবরের ছবি তুলতে গেলে বাধার মুখোমুখি হতে হয়। পরে পুলিশকে জানানো হলে তারা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ভাঙা বেড়া পুনরায় জোড়া লাগানো হয়। স্থানীয় মুসলিম সামাদ আলী উজির শেখ, তাসু শেখ ও আজু শেখের নামে থানাতে স্থানীয় হিন্দুরা অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করেনি। রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের মুখে হিন্দুদের জমি দখল হওয়ার উপক্রম হলেও মুসলিমদের ভোট ব্যাঙ্কের লোভে চটাতে চাইচ্ছেন না। বর্তমানে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ রয়েছে।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়। চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না। — সঃ স্বঃ

অসমে শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল আসু

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ অসমে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার বেহাল দশা নিয়ে রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করল 'অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন' বা আসু। একটি প্রতিষ্ঠিত এন জি ও-র সমীক্ষার ভিত্তিতে আসু নেতারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই গুরুতর অভিযোগ করেছেন।

সম্প্রতি অসম রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পঞ্চ ম শ্রেণীকে প্রাক্-প্রাথমিক (pre-primary) এবং অষ্টম শ্রেণীকে উচ্চ-প্রাথমিক (upper-primary) স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কিন্তু ঘটনা হলো এজন্য শিক্ষার পরিকাঠামোগত পরিবর্তন বা উন্নয়ন কিন্তু করা হচ্ছে না। গুয়াহাটি ভিত্তিক এন জি ও (Pratham) সব জেলা এবং প্রদেশ থেকে দেশজুড়েই তথ্য সংগ্রহ করেছে। তারা গত ১৪ জানুয়ারি 'এ্যনুয়াল স্ট্যাটাস্ অফ্ এডুকেশন' রিপোর্ট শীর্ষক সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এবছরের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত হালফিলের সব তথ্য ওই সমীক্ষায় স্থান পেয়েছে।

ওই সমীক্ষা অনুসারে অসমে সর্বশিক্ষা অভিযানে প্রচুর বহু কোটি টাকা ঢালা সত্ত্বেও রাজ্যের এগারো থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের ৫ থেকে ১০ শতাংশ মেয়েরা তো স্কুলেই যায় না। তিরিশ শতাংশ ছেলেমেয়ে প্রাথমিকে ভর্তি হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর ৫০-৬০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর বই পড়তে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর ৬০-৭০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা তো সামান্য যোগ-বিয়োগও করতে জানে না। পঞ্চম শ্রেণীর ৫০-৬০

গুয়াহাটিতে সাংবাদিক সম্মেলনে আসু-র সভাপতি শঙ্কর প্রসাদ রাই বক্তব্য রাখছেন।

শতাংশ পড়ুয়ারা কেবলমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর টেক্সট্ বই পড়তে পারে;আর তিরিশ শতাংশ তো 'ভাগ'-এর অঙ্কের কিছুই জানে না।

ওই সমীক্ষা মোতাবেক অসমের ৬৭.৭ শতাংশ স্কুলেই 'শিক্ষার অধিকার' সংক্রান্ত আইনে ছাত্র ও শিক্ষকের যে অনুপাত থাকার কথা তাও নেই। ৬০.৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। মাত্র ৩৪.৯ শতাংশ স্কুলেই বাথরুমের ব্যবস্থা আছে। ১৪ শতাংশ স্কুলে মেয়েদের জন্য বাথরুম রয়েছে। ২৮.৮ শতাংশ স্কুলে লাইব্রেরি আছে। আসু'র উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য বলেছেন, "অসমের কংগ্রেস সরকার শিক্ষা-ব্যবস্থা উন্নয়নে খুবই সামান্য কাজ করেছে। বার্ষিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সূচক রিপোর্টে সেই প্রকৃত তথ্যই ফুটে বেরিয়েছে মাত্র। আমরা এসব কথা বরাবর বলে আসছি। কোনও গভীর ভাবনা-চিন্তা না করেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় রদবদলের সিদ্ধান্ত হয়েছে। অসমের অধিকাংশ স্কুলেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। ক্লাসরুম, শিক্ষক— কিছুই পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা বরদাস্ত করা হবে না।"

এজন্য সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এবং শিক্ষামন্ত্রী গৌতম বরাকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের শোচনীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিৎ। রাজ্যের বাস্তব অবস্থা না জেনেই তাঁরা নিয়ম-নীতি পরিবর্তন ও প্রবর্তন করছেন। নিজেদের খেয়াল-খুশীমতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। শ্রী ভট্টাচার্যের জিজ্ঞাস্য— তারা কি জানেন এরকম হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সঙ্গীন হয়ে পড়বে? সরকার এরকম সিদ্ধান্ত নিলে ছাত্রসংগঠন হিসেবে 'আসু' আন্দোলনের পথে যেতে কোনও দ্বিধা করবে না।

আসু'র সভাপতি শংকরপ্রসাদ রাই জানিয়েছেন, "রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ১৪,০০০ শিক্ষক-অধ্যাপকের পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। রাজ্যের বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনও প্রধান শিক্ষকই নেই। এছাড়াও বহু প্রাথমিক স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষক। ওই একজন শিক্ষককেই সব বিষয় সব শ্রেণীতে পড়াতে হয়। এরকম এক পরিস্থিতিতে গত বছর ৩১ ডিসেম্বর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পঞ্চ ম শ্রেণী প্রি-প্রাইমারিতে এবং অষ্টম শ্রেণী আপার-প্রাইমারী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।" শ্রীরাই ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, পরিকাঠামোই যেখানে নেই সেখানে ছাত্ররা কি পথে পথে বা গাছের তলায় লেখাপড়া করবে?

আসু'র পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে উপরোক্ত বিষয় নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী জানানো হয়েছে।

উপকূলে উপদ্রব জলদস্যুদের দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কালো ছায়া

গত ২৯ জানুয়ারি লাক্ষাদ্বীপে ভারতীয় নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে ধৃত সোমালীয় জলদস্যুদের আনা হচ্ছে মুম্বাইতে।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে সমুদ্র উপকূল এলাকায় জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য ইদানীংকালের মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (ই ই জেড)-এ অন্তত তিনটি পৃথক জলদস্যু গোষ্ঠীর উপস্থিতি নজরে পড়েছে উপকূলরক্ষী বাহিনীর। কিছুদিন আগেই মুম্বই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ২৮ জন সোমালীয় জলদস্যু। লাক্ষাদ্বীপে এম ভি চিয়স জাহাজে জলদস্যু আক্রমণের ঘটনায় এই ধৃত সোমালীয় জলদস্যুরাই জড়িত ছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। পশ্চিম উপকূল রক্ষী বাহিনীর কম্যান্ডার এস পি এস বাসরা জানিয়েছেন, 'দেশের ই ই জেড অঞ্চলে তিনটি জলদস্যু গোষ্ঠী এখনও খুবই সক্রিয় রয়েছে।' এর পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পাকিস্তানি জঙ্গিরা বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ২৬/১১-এর মতো ঘটনা পুনরায় ঘটাতে পারে। বাসরার বক্তব্য, "ভারতীয় ই ই জেডের খুব কাছে জলদস্যু হানার ঘটনা যেভাবে বাড়ছে তাতে উদ্বিগ্ন উপকূল রক্ষীবাহিনী পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।"

প্রসঙ্গত, অপহৃত থাই ট্রলার প্রান্তালয় —১১ থেকে গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২৮ জন জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী গত ১০ ফেব্রুয়ারি মুম্বই-তে স্থানীয় পুলিশের হাতে ২৪ জন মৎস্যজীবী-কে তুলে দেন। গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাত্রে আই সি জি এস সামার-এ করে ধৃত জলদস্যু এবং উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীবীরা এবং অপহৃত প্রান্তালয়— ১১ জাহাজটি মুম্বাইয়ে এসে পৌঁছয়। জানা গিয়েছে অপহৃত জাহাজটিকে জলদস্যুরা 'মাদার ভেসেল' হিসেবে ব্যবহার করতো।

বাসরা আরও জানিয়েছেন যে গত তিন মাসে ভারতের সমুদ্র উপকূলে অন্তত চারটে দস্যুহানা সংঘটিত হয়েছে। গত বছরের ৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশের পতাকা লাগানো জাহাজ এম ভি জাহান মোনী (যার ক্রু সংখ্যা ২৬)-কে আরব সাগরে অপহরণ করে সোমালিয়ায় নিয়ে যায় জলদস্যুরা। মিশরের পোর্ট সুয়েজ খাল হয়ে গ্রীসের দিকে যাবার সময়েই নির্জন পরিবেশে এটিকে অপহরণ করে জলদস্যুরা। সেই শুরু। এরপর দ্বিতীয় আক্রমণটি হয় গত ২৮ জানুয়ারি লাক্ষাদ্বীপে। বাহামা দেশের পতাকা লাগানো এমভিসিএমএ সিএমজি ভার্দি জাহাজটিকে অপহরণের চেষ্টা করে সোমালীয় জলদস্যুরা। ভারতীয় নৌবাহিনী এবং উপকূল রক্ষীবাহিনী লক্ষ্য করে অপহৃত ট্রলার প্রান্তালয়কে দস্যুরা তাদের মাদার ভেসেল হিসেবে ব্যবহার করছে এবং আরব সাগরের বিভিন্ন জায়গায় জলদস্যুগিরি চালাতে এর ফলে তাদের সুবিধেই হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০ জন থাই এবং মায়ানমারীয় মৎস্যজীবী ২০১০-এর এপ্রিল থেকেই পণবন্দী ছিলেন সোমালীয় জলদস্যুদের হাতে। সবমিলিয়ে নৌবাহিনী এবং উপকূল রক্ষীবাহিনী উপলব্ধি করে যে দস্যুদের মাদার ভেসেলটিকে মুক্ত না করতে পারলে এই দৌরাত্ম্য ঠেকানো যাবে না। অবশেষে সম্মুখ সমরে ১০ জন সোমালীয় জলদস্যুকে নিহত করে এবং বাকি ১৫ জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করে মুক্ত করা হয় প্রান্তালয় জাহাজ এবং পণবন্দী ওই মৎস্যজীবীদের। ধৃত জলদস্যুদের আনা হয় মুম্বাইতে।

জলদস্যুবিরোধী এই অভিযানে ভারতীয় নৌ-বাহিনী এবং উপকূল রক্ষীবাহিনীর পরবর্তী সাফল্য মেলে গত ৬ ফেব্রুয়ারি। ওইদিন ২৮ জন জলদস্যুকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি জাহাজের ২৪ জন ক্রু-কেও উদ্ধার করা হয়। অপহৃত থাই ট্রলার প্রান্তালয়-১১-কেও মুক্ত করা হয় ওইদিন। কাভারাত্তি আইল্যাণ্ডের ১০০ কিমি উত্তরে গ্রীক-পতাকাবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ এম ভি চিয়সে জলদস্যুরা আক্রমণ চালালে তাকে একই কায়দায় দস্যু-মুক্ত করে ভারতীয় নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনী।

এনিয়ে সাম্প্রতিকতম আক্রমণের ঘটনাটি হলো, গত ৮ ফেব্রুয়ারি ভোররাতে ভারতীয় উপকূল থেকে ৫৫০ নটিক্যাল মাইল দূরে ইতালীর পতাকা লাগানো অপরিশোধিত তেলের জাহাজ এম টি সাবিনা সাইলন (যার ক্রু সংখ্যা ২২—১৭ ভারতীয় ও ৫ ইতালীয়)-কে অপহরণ করে ৫ সশস্ত্র সোমালীয় জলদস্যুদের একটি দল।

সব মিলিয়ে ভারতীয় উপকূল ঘিরে যেভাবে জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে দেশের উপকূলীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে বলে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান বাংলা ও বাঙ্গালী

শৌর্য্যধ্বজ সৌকালিন ঘোষ

দেশভাগের সময় অখণ্ডবঙ্গবাসী বাংলাভাষাভাষী মানুষের মধ্যে মুসলমান ছিল প্রায় ৫৪ শতাংশ ও হিন্দু প্রায় ৪৬ শতাংশ। আজ পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে মিলিতভাবে বসবাসকারী বাংলাভাষাভাষী মানুষের মধ্যে মুসলমান প্রায় ৬৭ শতাংশ ও হিন্দু প্রায় ৩৩ শতাংশ। যখন হিন্দু বাঙালীর সংখ্যা সমগ্র বাংলাভাষাভাষী সমাজে ক্রমশঃ কমছে এমত অবস্থায় আরও একশ বছর পর হিন্দু-মুসলমান অনুপাত বাংলাভাষাভাষী মানুষের মধ্যে কি হতে চলেছে তা সহজেই অনুমেয়। সে ক্ষেত্রে অখন্ড বঙ্গে হিন্দু বাঙালীর দশা কি হোত তা সিন্ধু প্রদেশের (যা এখন পাকিস্তানভুক্ত) হিন্দু সিন্ধিদের যাযাবর দশা ও পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের ব্যাপক হারে এদেশের মাটিতে শরণার্থী হয়ে আসা থেকেই অনুমান করা যায়।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা দেশত্যাগ পশ্চিমবঙ্গ দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির নাভিশ্বাস উঠে গেছে। আমাদের নিজের দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের জনস্রোত। শ্রীবিপ্রদাস ভট্টাচার্য মহাশয় তার 'ইসলামিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা কেমন আছেন' গ্রন্থে সঠিক লিখেছেন, "যদি হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনও মানুষ এ দেশ (বাংলাদেশ) ছেড়ে না যেতেন তাহলে বাংলাদেশে এখন হিন্দু জনসংখ্যা দাঁড়াত সোয়া তিন কোটি...।" সেখানে বাংলাদেশে বর্তমানে হিন্দুর জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষের মতো। সেদিক থেকে শ্রীরাণা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে "পশ্চিমবাংলায় হিন্দুর আচরণ অনেক ভদ্র...।" এছাড়াও সাম্প্রদায়িক বিভাজন হেতু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কোনও দক্ষিণপন্থী শক্তির আবির্ভাব হয়নি যেমন পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে হয়েছে। ওটা মূলতঃ ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের প্রভাব।

একটা প্রশ্ন প্রায়ই উঠে আসে তা হলো ভারতীয়ত্ব ও হিন্দু বাঙালীর সম্পর্ক। বাংলার সংস্কৃতি ও রাজনীতি চিরকাল নিয়ন্ত্রণ করেছে মূলতঃ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী। হিন্দু বাঙালীর মধ্যে এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর ভদ্রলোকের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। ভদ্রলোক বলতে ঊনবিংশ শতকে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের বোঝাত। তাঁদের মধ্যেই শিক্ষার হার ছিল সর্বাধিক। আরও পরিষ্কার করে বললে বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষাল এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং ঘোষ, বোস, মিত্র, গুহ, দত্ত এই পঞ্চ কায়স্থ বাঙালী পরিবার থেকে বেশীর ভাগ নবজাগরণের প্রাতঃস্মরণীয় নেতারা এসেছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙালীর উৎপত্তি', 'অনার্য্য', 'আর্য্যীকরণ', 'অনার্য্য বাঙালী জাতি', 'আর্য্য শূদ্র' প্রভৃতি প্রবন্ধে বাংলা ও বাঙালী জাতির সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। The New Encyclopedia Britanica পরিষ্কার লিখেছে, হিন্দুরা বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে বাস করছিল সমগ্র তুর্কি-আফগান ও মোগল শাসকের সময়কালে। এমনকী ১৮৭২ সালেও বাংলায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ হিন্দু ও ১ কোটি ৬০ লক্ষ মুসলমানের বাস ছিল। ১৮৯০ এর পরবর্তীকালে বাংলায় হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হতে থাকে। বাংলার সুফি সম্প্রদায়ের প্রভাব বাংলার নিম্নবর্ণের হিন্দুর উপর বেশি পড়েছিল, কারণ আর্য সংস্কৃতির প্রভাব বাংলার উচ্চবর্ণকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল নিম্নবর্ণকে সেরূপ করেনি। (পৃষ্ঠা ৭১৫) পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালীর বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Encyclopedia Americana লিখেছে, বাংলাদেশের বাঙ্গালী সমাজকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। (১) মুসলমান বাঙ্গালী যাঁদের পূর্বপুরুষগণ হিন্দু ছিলেন। (২) মুসলমান বাঙ্গালী যাঁরা নিজেদের আরব থেকে আগত মুসলমানদের বংশধর মনে করেন। (৩) হিন্দু সম্প্রদায়। (৪) দরিদ্র বাঙ্গালী সমাজ যাঁদের বিভিন্ন ধর্মাচরণকে সম্পূর্ণভাবে মুসলমান বা হিন্দু বলা যাবে না। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের বিভিন্ন সংস্কার তাঁদের মধ্যে বিরাজমান। (পৃষ্ঠা ১৬১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালী বহু জাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য্য (যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য), দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু (যেমন নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ), তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু (যেমন উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর মিলনের ফলে উভয়কুলজাত হিন্দু), চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। চারিভাগ পরস্পর পৃথক থাকে। বাঙ্গালী সমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙ্গালী মুসলমান;উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য্য। এই জন্য দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালীজাতি অমিশ্রিত আর্য্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস এক আর্য্য বংশী জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পরবর্তী সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাভাষা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্পর্কে মতামতগুলি যুক্তিপূর্ণ। বর্তমানকালের লেখকদের প্রবন্ধে যেমন আজকের রাজনীতির গন্ধ প্রবলভাবে উপস্থিত তা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই মুক্ত হবার ফলে অভিমতগুলি অনেক উচ্চমানের ও ঐতিহাসিকভাবে সত্য বলে মনে হয়। হিন্দু বাঙ্গালী মহাপুরুষরা তাঁদের বাঙ্গালীত্বের বহু উপরে স্থান দিয়েছেন তাঁদের ভারতীয়ত্বকে। বেদ-বেদান্ত, উপনিষদের আলোকে নিজেদের তাঁদের ভারতীয়ত্বকে। বেদ-বেদান্ত, উপনিষদের আলোকে নিজেদের হৃদয় রাঙিয়ে নিয়েও তাঁরা উদারভাবে পশ্চিমের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ এঁরা সকলেই সমন্বয়ের পথের পথিক।

হিন্দু বাঙ্গালীর কিছু অংশ এখন মানসিক ভাবেই বিশ্বনাগরিক। এমন সময় তাঁকে শুধু হিন্দুর গন্ডিতে বেঁধে দেওয়া হোক তাঁরা তা চান না। হিন্দুর চেয়ে মানবতাবাদী বলতে নিজেকে সে বেশি পছন্দ করে। অনেকে আবার নাস্তিকও। তবুও হিন্দু বাঙ্গালীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক বিশাল অংশ আজও বিবেকানন্দ অনুসারী ও বৈদান্তিক চিন্তার প্রতি অতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁদের হিন্দু পরিচয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মের প্রভাব সুগভীর। বাঙ্গালী হিন্দুর একাংশ নিজেদের হিন্দু পরিচয় অস্বীকার করলেও তাঁরা হিন্দু সমাজে সংখ্যালঘু অংশ। বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুগামী ও উদারপন্থী। স্বামীজী যেমন বিশ্বনাগরিক হয়েও হিন্দু ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সেই আদর্শই অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্রলোক বিশ্বাসী। বর্তমানকালে সাহিত্যে নাস্তিক হিন্দু বাঙ্গালীর একটি শক্তিশালী অংশ থাকলেও সাহিত্যিক কুল চূড়ামণি আস্তিক রবীন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্যে হিমালয়ের ন্যায় সুমহান উপস্থিতির ফলে তাঁর প্রভাবই বাঙ্গালী হিন্দুর উপর সর্বাধিক। হিন্দু বাঙ্গালী ভদ্র সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রবীন্দ্র অনুরাগী। কবিগুরু বিশ্ব নাগরিক, মানবপ্রেমিক, উদারবাদী হলেও বেদ-বেদান্ত ও উপনিষদের ধর্মের প্রতি ছিলেন অতি শ্রদ্ধাশীল। রাজনীতির প্রাঙ্গণে হিন্দু বাঙ্গালীর টান সমাজতন্ত্রের প্রতি কিন্তু ধর্মের প্রতি বিরাগ তার নেই। সমাজতান্ত্রিক হতে গেলে নাস্তিক হতে হবে এ কথা সে বিশ্বাস করে না। সেজন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট দল মত নির্বিশেষে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। যিনি সমাজতান্ত্রিক হলেও সম্পূর্ণ আস্তিক, বিবেকানন্দ অনুগামী ও বেদান্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। হিন্দু বাঙ্গালী তাই রাজনীতির ক্ষেত্রে সুভাষভক্ত। সেজন্য হিন্দু বাঙ্গালী ভদ্রলোক যারা ধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে স্থিত, সাংস্কৃতিক জগতে রবীন্দ্র অনুরাগী ও রাজনীতিতে সুভাষভক্ত তাদের উদারপন্থী অসাম্প্রদায়িক হওয়াই স্বাভাবিক। তাই পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিন্তে আছেন থাকবেনও। তবে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার স্বাধীনতা উত্তর চরিত্র বজায় থাকে যেন, সেদিকে সতর্ক নজর থাকা ভবিষ্যতের জন্য জরুরী। তাই বহিরাগতের স্রোত আটকাতে নিষ্ঠাবান হতে হবে, সরকারকে বহিরাগতের আগমনের পথ বন্ধ করতে সীমান্তে বেড়া দিতে হবে। আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে দেশের নাগরিকদের সন্তুষ্ট করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র রক্ষার জন্য পূর্ববঙ্গের থেকে জনস্রোতকে আমন্ত্রণ জানান— অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কোনও দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য নয়। সভ্য, অসাম্প্রদায়িক পথ হলো বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তকে সুরক্ষিত করে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করা এবং পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনসংখ্যাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার আওতায় এনে দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রয়োগ করা। ভোটের স্বার্থে অনুপ্রবেশকে সমর্থন করলে বিপদ সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির থেকে শিক্ষা নিয়ে গরীব দরদী অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে বিবেকানন্দের আলোকে আলোকিত, সুভাষ বসুর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন প্রভাতের আগমন ত্বরান্বিত করতে হবে। তাই সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য জনগণকে তৈরি করতে গেলে লাগামহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বহিরাগতের বিরামহীন আগমন পশ্চিমবঙ্গের মতো ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিকাঠামোই ভেঙ্গে দেবে। তাই এব্যাপারে সজাগ হওয়া আশু কর্তব্য।

সাধারণ মুসলমান বাঙ্গালীর বেশীর ভাগই হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার জন্য নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। তবে আশ্চর্য ব্যাপার হলো হিন্দু সমাজে জাতপাতের সমস্যা সমগ্র ভারতবর্ষেই ছিল কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে যেখানে জাত-পাতের সমস্যা প্রবলভাবে বিরাজমান সেখানে কিন্তু নিম্নবর্ণের মধ্যে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণের ফলে জনবিন্যাসের চরিত্র বদল হয়ে যায়নি। এমনকী বাংলায় ও সমগ্র মোগল-পাঠান যুগে হিন্দু বাঙ্গালী অখন্ড বাংলায় তার গরিষ্ঠতা হারায়নি। বাংলাদেশের হিন্দু বাঙ্গালী জমিদাররা যদি একটু সজাগ হয়ে মাটির কাছাকাছি থাকতেন এবং ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়াকে নিজ নিজ জমিদারী এলাকায় নিয়ন্ত্রণ করতেন তবে বাংলায় হিন্দু বাঙ্গালী সংখ্যালঘু হয়ে পড়ত না। ১৮৭০ থেকে ১৯০৫— এই পঁয়ত্রিশ বছরেই বাংলায় হিন্দু তাঁর গরিষ্ঠতা হারায়। ১৮৭০ এর আগে হিন্দু বাঙ্গালী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিসাবে বাংলায় বসবাস করছিল এবং ১৯০৫ এর পর ধীরে ধীরে মুসলমান বাঙ্গালী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ১৮৭০ থেকে ১৯০৫ যে সময় কলকাতায় হিন্দু বাঙ্গালীর নেতৃত্বে নবজাগরণের প্রবল, প্রতাপ যখন রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের গর্বিত উপস্থিতিতে কলকাতায় ভদ্র হিন্দু সমাজ ক্রমশ সংগঠিত হয়ে কুসংস্কার ও ভেদাভেদ ভুলে উদারপন্থী আন্দোলনকে আহ্বান জানাচ্ছে, তখনই এই নবজাগরণের দীপশিখা নিয়ে যদি পূর্ববঙ্গের প্রতাপশালী হিন্দু জমিদার গোষ্ঠী গ্রামে গ্রামে এই নবজাগরণের আলো ছড়িয়ে দিতে পারতেন তাহলে সাম্প্রদায়িক মুসলমান রাজনীতি শক্তিশালী হবার বহুপূর্বেই আমরা বাংলার গ্রামকেও নতুন আলোর সন্ধান দিতে পারতাম। শহরের নবজাগরণে শিক্ষিত ভদ্র হিন্দু বাঙ্গালী নিজে আলোকিত হয়ে অন্যকে আলোকিত করার দায়িত্ব আজ যেভাবে, নিয়েছে সেদিন সেভাবে নিলে পূর্ববঙ্গের গ্রামে অন্ধকার বাসা বাঁধতে পারত না। কলকাতার আলো সেখানেও প্রবেশ করত। হিন্দু বাঙ্গালী উচ্চবর্ণ তাঁর সেই ছুঁৎমার্গের সনাতন দোষ ঝেড়ে ফেলতে পারল না। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এককালে শিক্ষাকে যেমন নিজ নিজ কুক্ষিগত করতে গিয়ে সমাজকেই দুর্বল করে দিয়েছিল তেমনি আমরা কলকাতার হিন্দু বাঙ্গালী ভদ্র সম্প্রদায় ভাবলাম এসব নতুন চিন্তার আলো শুধু আমাদের কজনের জন্য। নতুন চিন্তার সূত্রগুলি যে সবার জন্য প্রযোজ্য, এতে যে সবার সমান অধিকার সেদিন হিন্দু বাঙ্গালীর বনেদি অভিজাত ভদ্র সমাজে অধিষ্ঠিত আমাদের কুলীন ব্রাহ্মণ-কুলীন কায়স্থ পূর্বপুরুষরা হয় বুঝেও বোঝেনি না হয় বোঝার চেষ্টাই করেননি। তা না হলে জমিদার, উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার, লেখক, দার্শনিক দ্বারা সমৃদ্ধ হিন্দু বাঙ্গালী সমাজ যাঁরা অর্থনৈতিকভাবে সেদিন মুসলমান বাঙ্গালী সমাজের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল, তাঁরা নিশ্চেষ্ট না হলে কি বাংলার সমাজের রাশ তাদের হাতের তালু থেকে ফস্কে যায়। তাঁরা সেদিন দেশভাগের দুর্দিনের কথা অনুধাবন করতে পারেননি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিক্ষিত ভদ্র উচ্চবর্ণের হিন্দু বাঙ্গালী কিন্তু সমানভাবে নির্লিপ্ত হয়ে অনুপ্রবেশকে গুরুত্ব না দিয়ে এক যুগান্তকারি বিপদ ডেকে আনছে। শ্যামাপ্রসাদের জন্য পাওয়া পশ্চিমবঙ্গও হাতের বাইরে চলে যেতে বসেছে। প্রথম বঙ্গভঙ্গের সময় হিন্দু বাঙ্গালী যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধীনতার পক্ষে ও সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে লড়াই করেছিল, সেই নিষ্ঠার সঙ্গে যদি মুসলমান বাঙ্গালী

(এরপর ১৩ পাতায়)

"স্বাধীনতা উত্তর ৬৪ বছরে দেখা গেল মুর্শিদাবাদে হিন্দুর জনসংখ্যা ৪৫ শতাংশ থেকে কমে প্রায় ৩৫ শতাংশ আর খুলনায় হিন্দু তার গরিষ্ঠতা হারিয়ে প্রায় অন্তর্জলি যাত্রার পথে। এর সঙ্গে আরও ভয়াবহ খবর হলো মালদা তার হিন্দু গরিষ্ঠতা হারিয়ে দ্বিতীয় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে দ্বিতীয় বার উদ্বাস্তু হবার জন্য তৈরি হওয়া ভালো।"

একান্ত সাক্ষাৎকারে বিভাস চক্রবর্তী

বামশাসনে ধ্বংস হয়েছে মানুষের সততা, মূল্যবোধ, মানবিকতা

স্বস্তিকার আলোকচিত্রীর ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে প্রবল অস্বস্তিতে তিনি — 'এরকম বাড়ির পোষাকেই ছবি নিলে!' শেষপর্যন্ত ধরা দিলেন ঘরোয়া মেজাজেই। পরম নেতাজীভক্ত মানুষটি খুঁজে বার করেছেন নাট্যমোদী শ্যামাপ্রসাদকে। নিজের নাট্যচর্চাতে অনিবার্যভাবেই রাজনীতির ছায়া। মুখ খুললেন রাজনীতি থেকে সমাজনীতি, নানা বিতর্কিত বিষয়ে। মঞ্চের বাইরে অকপট অন্তরঙ্গ বিভাস চক্রবর্তীকে ধরলেন স্বস্তিকা-র প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।

বৈঠকী মেজাজেই চোখ স্বস্তিকার পাতায়।

❑ দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির কাছে যেদিন কয়েকজন বিদ্বজ্জন দরবার করতে গিয়েছিলেন সেদিন তাদের দলে আপনাকে দেখা গেল না। কারণটা কি? কোনও কাজ ছিল না অন্য কিছু?

● আমি যাইনি কারণ, প্রথমত আমার কাজ ছিল। কাজ ফেলে দিল্লী-টিল্লি যাওয়ার অসুবিধা আছে। দ্বিতীয়ত, আমি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করার ব্যাপারে খুব একটা বিশ্বাসীও নই।

❑ বিশ্বাসী নন কেন? কোনও কাজ হবে না বলে না কি এযাবৎ কোনও কাজ হয়নি বলে? কেন্দ্রের ওপর কতটা বীতশ্রদ্ধ আপনি?

● আসলে এখানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি তো বহুদিন ধরেই চলছে, সেই জায়গায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনও পদক্ষেপ তো গ্রহণ করতে দেখিনি। তাঁরা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সময় থেকেই বহু পদক্ষেপ নিতে পারতেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা নীরব ছিলেন। রাজ্যের মানুষ তাঁদের কাছে অভিযোগ জানালেও তাঁরা কিছুই করেননি। সেইজন্য তাঁদের কাছে গিয়ে ফের দরবার করার প্রয়োজন অনুভব করিনি। তবে এটাও ঘটনা আমার অনেক কাছের মানুষ সেদিন অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন। তাই সময় থাকলে আমিও হয়তো যেতে পারতাম।

❑ কিন্তু এর অন্যতম কারণ কি এটাই যে কেন্দ্র সরকার বরাবর ভেবে এসেছে যে সিপিএম-ই তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু। তৃণমূলী বিদ্বজ্জনরা নয়?

● বিদ্বজ্জনেদের নামের আগে এই 'তৃণমূলী' শব্দটা যুক্ত করাকে আমি ভীষণ অপছন্দ করি। এটাকে সঠিক বলে আদৌ মনে করি না। বিদ্বজ্জন কথাটাতেও আমার আপত্তি আছে। আমি বিদ্বজ্জন কিংবা পণ্ডিত মানুষ নই। আমি বুদ্ধিজীবীও নই। কারণ একজন বুদ্ধিজীবীর যেসব গুণাবলী থাকা দরকার তা আমার নেই। আমি একজন শিল্পী। সেই হিসেবে আমার একটা পরিচিতি আছে মাত্র।

❑ কিন্তু এটা তো মানবেন যে আপনারা অনেকেই মনে করছেন— Left (বামপন্থা) is Right (সঠিক) এবং Right (দক্ষিণপন্থী, এক্ষেত্রে তৃণমূল) is now Left (বামপন্থী)।

● না, তা ঠিক নয়। তথাকথিত বামপন্থীদের ৩৩ বছরের জমানায় আমরা দেখেছি যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মূল্যবোধকে কিভাবে নিচে টেনে নামানো হয়েছে। সেজন্যই বলবো যে এর পরিবর্তন দরকার। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকার কথাই নয়। কিন্তু তারপর কে আসবেন এটা তো জনগণ স্থির করবেন। তবে বাস্তবকে মেনে নিলে স্বীকার করতে হবে যে তৃণমূলের নেতৃত্বেই পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

❑ এই তেত্রিশ বছরটাকে কোনও ভাগে ভাগ করতে চাইবেন? যেমন ধরুন অমুক সময় থেকে তমুক সময়, এঁরা এরকম ছিলেন। কিন্তু তারপর হঠাৎ বদলে গেলেন। পুঁজিপতিদের দালাল কিংবা ফ্যাসিবাদী এরকম কিছু একটা হয়ে গেলেন। এভাবে কোনও 'টাইম-স্প্যান' করার পক্ষপাতী আপনি? নাকি ক্ষমতায় আসার পর পুরোপুরি ৩৩ বছর ধরেই এদের নৃশংসতা, বর্বরতাকে চিহ্নিত করবেন?

● হ্যাঁ, তাই করা দরকার। প্রথমদিকে কিছু সময় হয়তো মনে হয়েছিল যে এঁরা উন্নয়নের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে একটা দিশা দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু '৮০-এর দশক থেকেই এই বামপন্থীদের স্বরূপটা মানুষের চোখে ধরা পড়ে গেল।

❑ অর্থাৎ বামরাজত্বে মরিচঝাঁপির গণহত্যা থেকেই সিপিএমের অপকর্ম-কে আপনি চিহ্নিত করতে চাইছেন?

● হ্যাঁ। তবে শুধু মরিচঝাঁপি কেন? ৩৩ বছরে এদের অপকর্মের শেষ আছেনাকি!

❑ '৪৭-এর দেশভাগ আপনাকে যথেষ্ট ব্যথিত করেছিল জানি। কোন্‌টা আপনাকে বেশি পীড়া দেয়— '৪৭-এর দেশভাগ নাকি সাম্প্রতিক সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাইগ্রাম?

● দু'টোর তুলনা অবশ্যই করা উচিত নয়। দেশভাগের বেদনা অনেক বেশি। সেটা ছিল জাতীয় জীবনের বিপর্যয়। দেশের কিছু মানুষকে যেভাবে ভূমিচ্যুত করা হয়েছিল;তার সংস্কৃতি, পরিবেশ, সমস্তকিছু থেকে চ্যুত করে দেশান্তরী করা হয়েছিল স্রেফ এই কারণ যে কিছু মানুষ শাসন ক্ষমতা পাবেন, কোনও দল শাসন ক্ষমতায় বসবে।

❑ তখনকার আর এখনকার মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বদল আপনাকে কতটা ব্যথিত করে?

● আসলে ব্যাপার হলো সেইসময় দেশপ্রেমের যে দৃষ্টান্তগুলো আমরা দেখেছিলাম, পরবর্তীকালে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা আর লক্ষ্য করা যায়নি। আরও একটা ব্যাপার, দেশভাগের সময় কিন্তু— এই যে যাদের বুদ্ধিজীবী কিংবা বিদ্বজ্জন বলা হয় তাঁরা তখন কোনও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি। এটা খুব বেদনার ব্যাপার। অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত বলেছিলেন, যেদিন থেকে বুদ্ধিজীবীরা দেশভাগের প্রতিবাদ জানালেন না, সেদিন থেকেই এই পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের ভূমিকা ধীরে ধীরে কিছুটা অপসৃয়মান হয়ে গেল।

❑ দেশভাগের প্রেক্ষাপটে শিক্ষাব্রতী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষের মানুষ দেশনেতার পদে বরণ করে নিয়েছিলেন। একথা আমাদের জানা। কিন্তু আপনি নাট্যমোদী শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে একবার আলোকপাত করেছিলেন। সেই বিষয়টাই জানতে চাইব।

● শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আমরা শিক্ষাবিদ তো বটেই, তবে মূলতঃ স্বনামধন্য একজন রাজনীতিক হিসেবেই চিনি। তবে বিভিন্ন নথি সন্ধান করে আমি দেখতে পেয়েছি তিনি যখন এম এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন তখন বাংলা থিয়েটারের ওপর একটা স্পেশাল পেপার লিখেছিলেন। সেটা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। এরকম একজন মানুষের থিয়েটারের সম্বন্ধে কী আগ্রহ, কী জ্ঞান, ওই অল্প বয়সে সেই সম্বন্ধে কী ব্যুৎপত্তি এটা দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল।

❑ আপনাকে একজন নেতাজী-ভক্ত হিসেবেই জানি। কি মনে হয় নেতাজী ফিরে এলে দেশের এই হাল হোত? দেশভাগের মতো, যেটাকে আপনি জাতীয় বিপর্যয় বললেন, তা রোধ করা যেত?

● আমার তো তাই মনে হয় যে নেতাজী ফিরে এলে হয়তো দেশভাগ এড়ানো সম্ভবপর হোত। তবে মনে হওয়া দিয়ে সবকিছু বিচার করা চলে না। উনি ফিরে এলে কি করতেন, তাই সেটা নিয়ে কথা বলা মুশকিল। এটা হাইপ্যাথেটিক্যাল প্রশ্ন হয়ে যায় যে উনি বেঁচে থাকলে কি করতেন। তবে যে জীবন-আদর্শ তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে ভাবনা-চিন্তাগুলো করেছেন তা বিচার করলে মনে হয় নেতাজী দেশভাগের মতো বিপর্যয় মেনে নিতেন না।

❑ তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী'র মৃত্যু হয়েছেবলে আপনি বিশ্বাস করেন?

● না। একেবারেই করি না।

❑ মিখাইল সাতরঙের 'ব্লু হর্স অন দি রেড গ্র্যাস' নাটকের ওপর ভিত্তিকরে রচিত আপনার সাম্প্রতিকতম, বহু-আলোচিত কিছুটা বা সমালোচিতও, নাটক 'শৃঙ্খল কমরেডস'-এ আপনি দেখিয়েছেন, ১৯২০ সালে রাশিয়ায় দাঁড়িয়ে লেনিন 'পেনসিল কারখানা' তৈরির কথা বলেছেন। এক সময়ে এক নম্বরে থাকা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থা গত ৩৩ বছরের বামরাজত্বে পেছতে পেছতে একেবারে নীচের সারিতে পৌঁছে গিয়েছে। এরাজ্যে 'পেনসিল কারখানা'র গুরুত্ব বর্তমানে কতটা?

● গুরুত্ব তো একটা রয়েছেই। মানুষকে অশিক্ষিত রাখলে তাদের ওপর কিছু রাজনৈতিক বুলি, কয়েকটি রাজনৈতিক স্লোগান চাপিয়ে দেওয়া সহজ হয়। তাদের মজ্জায় মজ্জায় তা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। মানুষকে আগে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা দরকার। তাহলে সে নিজেই তার ভাল-মন্দ বিচার করতে পারবে। কিন্তু শিক্ষাকে যেখানে স্বার্থান্ধ রাজনীতিকদের স্বার্থে চালিত করা হয় সেখানে এই জিনিসই ভবিতব্য। কৈশোরে ভাবতাম যে অবিভক্ত বাংলা শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠবে। কিন্তু এরা তা করতে দিল না।

❑ লেনিন বলতেন, 'বেয়নট দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করা যায় না। বড়জোর একটা ব্যারাক সৃষ্টি করা যায়'। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম কিংবা সাম্প্রতিকতম নেতাই-এ কতটা ব্যারাক সৃষ্টি করা গেছে?

● লেনিন একথা বলেছিলেন সেই প্রেক্ষিতে যখন কমিউনিস্টদের মধ্যেই কথা উঠেছিল যে, যেহেতু তারা সোভিয়েত রাশিয়ায় ক্ষমতায় আছে তাই অন্যান্য দেশেও বিপ্লব রপ্তানী করতে পারবে। কিন্তু লেনিন বলেছিলেন সেটা হয় না। যে দেশে বিপ্লব হবে, সেটা সেদেশের মানুষের ভেতর থেকেই উঠে আসবে। সেদেশের মানুষের আদর্শ কিংবা সংগঠনের জোরেই তা সাধিত হবে। বাইরে থেকে কোনও বিপ্লব আমদানী করে কিছু হবে না।

❑ কিন্তু এটাও তো ঠিক যে ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম এমন একটা ব্যারাকের সৃষ্টি করেছে যা বুদ্ধিজীবীদের 'আমরা-ওরা'-য় বিভক্ত করে দিয়েছে।

● এটা হতে বাধ্য। দেশভাগের কথা ভাবো। তখন অনেক রাজনৈতিক দলের তাবড় তাবড় নেতারাও পার্টির সিদ্ধান্তকেই শেষ কথা বলে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাহলে বলতে হয় যে সেটাও তো একটা ব্যারাক-ই ছিল। আমার বাবা অবিভক্ত বাংলার সিলেটের (শ্রীহট্ট) একজন কংগ্রেসী নেতা ছিলেন। তাঁকেও তো পার্টির সিদ্ধান্ত (দেশভাগের) মানতে হয়েছিল। এরজন্য পরবর্তী সময়ে তাঁকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু পার্টির শৃঙ্খলা বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক তাঁরা পার্টি-সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং মানতেই হবে যে ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ব্যারাকীয় ভাবনা বহুদিন ধরেই সুপ্ত আছে।

❑ একজন নাট্যকর্মী হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাইব, বিশেষ করে সেই বিষয়গুলো যেহেতু আপনার নাটকে বারবার উঠে এসেছে— এই যে আপনি বললেন দেশভাগের কালে রাজনীতিতে একটা আদর্শ নিষ্ঠার বিষয় ছিল, স্বাধীনতার পর সেটা রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেল কি করে?

● যদিও আমি সমাজতাত্ত্বিক নই। তবু

(এরপর ১৩ পাতায়)

ঐশী শক্তি

প্রসঙ্গ "একান্ত সাক্ষাৎকার ঃ শংকর" (স্বস্তিকা— ১৭.০১.১১)। সাংবাদিক অর্ণব নাগের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্বামী বিবেকানন্দের প্রখ্যাত জীবনী লেখক শংকর (মুখোপাধ্যায়) এক জায়গায় বলেছেন, "সত্যিকথা বলতে কি আমি মনে করি যে এঁরা মানুষ থেকে মহামানুষ হয়েছেন।...নিজেদের প্রতিভাকে ব্যবহার করে এঁরা মহামানুষ হয়েছেন। আমি এটাই বলব, কোন ঐশী শক্তির প্রভাবে আকাশ থেকে হঠাৎ আলো পড়ে তাঁরা তৈরি হয়ে যাননি।" এই প্রসঙ্গে আমার মতামত জানাতে চাই। ব্রহ্ম কোটির অবতার যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ঈশ্বর কোটির অবতারতুল্য মহাপুরুষ যেমন স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মানুষরূপে জন্মালেও এবং উত্তরণের শীর্ষে পৌঁছাতে সাধারণের মতো বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাধ্য হলেও, তাঁদেরকে সাধারণ মানুষ মাপার মানদণ্ডে বিচার করা যায় না। যেহেতু মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব, তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষরূপ পরিগ্রহ করেই তাঁদের অবতরণ। মনুষ্যেতর জীবের আধ্যাত্মিক কোনও সত্ত্বাই প্রায় নেই। মানুষরূপেই যে ঈশ্বরত্ব অর্জন সম্ভব তারই আদর্শ স্থাপন করেন তাঁরা। আর, তাঁদের অবতরণ যে আকাশ থেকে হঠাৎ আলোপড়ার মতোই তা এই অলৌকিক, আধিদৈবিক ঘটনায় প্রমাণিত। শ্রীঠাকুর ধ্যানচোখে দেখছেন স্বর্গে সাতজন ঋষি ধ্যানস্থ অবস্থায়। হঠাৎ এক দেবশিশু এসে এক ঋষিকে স্পর্শ করে বললেন, "আমি পৃথিবীতে যাচ্ছি, তুমিও এস।" ঋষি হাসলেন। দেবশিশুটি রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং সনাতন সাগরের অন্যতম ঢেউ, আর ঋষি হলেন—স্বামীজী। এটাই তো আকাশ থেকে আলো পড়া, তাছাড়া আর কী? রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্মরণীয় ঃ "গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা? ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখিয়ে করিতে পারি না সেবা।" জ্যোতির্ময় সূর্যদেবকে তো সেবা করা যায় না। তাই মহান সূর্যের আশ্বাসবাণী "আমি ছোট হয়ে রহিব তোমারে ধরি। তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব আমার মতন করি।" জ্যোতিরূপ পরমব্রহ্মই অবতরণের মাধ্যমে "ছোট হয়ে" মানুষকে পথ দেখাতে আসেন। তাই ঐশী শক্তির ভূমিকা অস্বীকার করতে পারা যায় না।

এরপর শংকর বলছেন, "নিজেদের প্রতিভাকে ব্যবহার করে এঁরা মহামানুষ হয়েছেন।" জাগতিক মানুষ জন্মজন্মান্তর ধরে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফলে অনন্য প্রতিভার অধিকারী হন, কিন্তু অবতারগণ ও তৎতুল্য আধ্যাত্মিক পুরুষগণ পরমস্রষ্টার জন্মান্তরবাদের আধিদৈবিক ব্যবস্থাপনার ঊর্দ্ধে। ধর্মে গ্লানি ঘটলেই তাঁদের অবতরণ এবং তা মানুষরূপেই, কারণ মনুষ্যেতর প্রাণীরা ধর্মের গ্লানির কারণ হতে পারে না প্রকৃতি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ তার কারণে।

এরপর শংকরের মন্তব্য ঃ "আমি পাঠকদের এটুকুই বলতে চাই যে এইসব মহামানুষদের দেবতার মতো শ্রদ্ধা করা যায়। কিন্তু "দেবতা"দের সচরাচর যেসব সুযোগ সুবিধা আমরা দিয়ে থাকি, যে তাঁরা অমর, তাঁদের শোক তাপ নেই, তাঁরা অপরাজিত—এসব কিন্তু এঁদের জীবনে হয়নি।" কিন্তু পড়াশোনায় জেনেছি যে দেবতারাও অমর নন, প্রলয়কালে তাঁরাও পরম উৎসরূপ পরব্রহ্মেলীন হয়ে যান এবং কালচক্রে পরবর্তী সৃষ্টির সঙ্গে আবার তাঁদেরও অবক্ষেপণ ঘটে।

—অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকেশ্বর, হুগলী।

নবজাগরণ রথ

গত ৩০ জানুয়ারি ২০১১ রাজ্য বিজেপি'র সভাপতির নেতৃত্বে এবং বিশিষ্ট কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে কুচবিহার থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছে তা বিভিন্ন জেলায় পরিক্রমা করে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ কলকাতায়— যেখানে আদবানীজী, নরেন্দ্র মোদি, সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলী, ভেঙ্কাইয়া নাইডু প্রভৃতি বিশিষ্ট কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয় আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে।

ঊনবিংশ শতকে যেমন নবজাগরণ নূতন দিগন্তের সূচনা করেছিল, ঠিক তেমনি বর্তমানে ভারত তথা বাংলায় মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও হিংসার রাজনীতি বাংলার জনজীবনকে অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দিয়েছে এবং জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা ও পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। যে হাওয়ায় ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট জমানা ধুয়ে মুছে যাবে এবং এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস নয়, একমাত্র বিজেপি বাংলাকে সঠিক উন্নয়নের পথের নিশানা দেখাতে পারবে এবং বাংলায় হিংসার রাজনীতি বন্ধ করে বাংলাকে আবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইনশৃঙ্খলা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে নিয়ে যেতে একমাত্র বিজেপিই সমর্থ হবে। তাই আজ বাংলার ঘরে ঘরে নবজাগরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সকলকে এই নবজাগরণে সামিল হতে আহ্বান জানাই।

—অধ্যাপক আশিষ রায়, বি. গার্ডেন, হাওড়া।

ছাত্র রাজনীতি

বিশ্বের সকল দেশেই ছাত্ররা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ও আজও করে চলেছে। তাদের সকল প্রয়াস সফলতার অভিমুখ দেখেনি! কিন্তু ছাত্রদের প্রতিবাদী চরিত্র শাসক গোষ্ঠীকে ভাবিয়েছে। স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী আচার-আচরণে অভ্যস্ত শাসকগোষ্ঠী নিজেদের অনেকটা সংযত করেছে।

নিকট অতীতে চীন দেশের রাজধানী বেজিং শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে ছাত্ররা গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবীতে মুখর হলে নির্মমভাবে দলিত হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানে পাক-শাসনের অবসান করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাঙালী ছাত্রদের, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, লাঞ্ছনা ও নির্মম মৃত্যুবরণ বিশ্বের যে কোনও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনে এক অনুকরণীয় ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ছাত্রদের অবদান আজ ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। তাই এই সব ছাত্র আন্দোলন পর্যালোচনা করলে যে কোনও দেশভক্ত নাগরিক উদ্দীপনা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে। বিদ্যালয়স্তরে ছাত্রদের সংসদ নির্বাচনের মধ্যে রাখা হয়নি! কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই দ্বার উন্মুক্ত! ফলে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে কোনও উপায়ে ছাত্র সংসদ গঠনই ছাত্র সংগঠনের নেতৃস্থানীয়দের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গভীর বেদনার সঙ্গে আমরা দেখছি ছাত্র সংসদ দখলের একমাত্র উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সদস্যকে হত্যা করতেও কারুরই হাত কাঁপছে না! অসহায় ছাত্রকে কাছে পেয়ে তার ওপর এই রকম নির্মম আচরণ কী জঘন্য, হীন মানসিকতার পরিচয়, তা ভাববার অবকাশও এরা খুঁজে পায় না! উন্মত্ত ও অপরিণামদর্শী হয়ে এ-হেন নিষ্ঠুর আচরণে প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করা সম্ভব নয়, এই সত্য বুঝতে পারছেনা এই ভ্রান্তমতিরা। উপায় ও লক্ষ্য পূরণে গরমিল হয়ে যাচ্ছে! তাই এক জায়গায় বিরতি দেখা দিচ্ছে সাময়িকভাবে। কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা! ব্যতিক্রম ভাবাই কঠিন হচ্ছে। বাংলার বর্তমান ছাত্র আন্দোলন যা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক, আজ সম্পূর্ণ দিশাহীন বললে বেশী বলা হয় না।

আমাদের ঋষিরা বলে গেছেন, 'একং সৎ। বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' অর্থাৎ 'ঈশ্বর এক। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। এই শ্লোক নিশ্চিতভাবে ব্যক্তির অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই ভাব প্রয়োগ করা দরকার। ছাত্ররা বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তায় বিভক্ত হতে পারে স্বাভাবিকভাবেই। আজ ভারতের গণতান্ত্রিক পটভূমিকায় এই প্রবণতা যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণীয়। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার আছে। তাই জোর করে ভিন্ন মত প্রচার, মঞ্চ গঠন, সমর্থনের আবেদনকে দাবিয়ে রাখা যেতে পারা যায় না। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত কর্মীদের এই সহজ ও পরম সত্যকে মেনে নেওয়া উচিত। এইভাবে চললে প্রকৃত ছাত্র অভিমতের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটবে।

—রণজিৎ কুমার সিংহ, কলকাতা।

ইয়েচুরির মুসলিম তোষণ

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোট ফিরে পেতে সিপিএম কতটা মরিয়া, ফের তার প্রমাণ মিলেছে দলের পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরির বক্তব্যে। গত ২৮ জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে এক আলোচনাচক্রে 'সংঘ সন্ত্রাস' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ইয়েচুরি বলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকর এবং বি এস মুঞ্জে যে আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তার থেকেই পরিষ্কার, হিন্দুত্বের সঙ্গে হিংসার সম্পর্কে নতুনত্ব কিছু নেই।"

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসবাদী হানার পিছনে হিন্দুত্ববাদী নেতাদের নাম টেনে আনা হয়েছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে আটক করা হয়েছে। এই সত্যকে আড়াল করতেই একটি মানবাধিকার সংগঠন ওই আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিল। সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং মন্তব্য করেন, "দ্বিজাতিতত্ত্বের জনক মহম্মদ আলি জিন্না নন, বরং হিন্দুত্ব আদর্শের পুরোধা বীর সাভারকর।" দিগ্বিজয়ের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে ইয়েচুরির বক্তব্য। সাভারকর বার বার হিন্দু ধর্মের সামরিকীকরণ এবং রাজনীতির হিন্দুত্বকরণের কথা বলেছেন। সুতরাং বর্তমান হিংসাশ্রয়ী ব্যবহারের মধ্যে নাকি নতুনত্ব কিছু নেই।

প্রশ্ন হলো, তাহলে কি কারাত লাইন উপেক্ষা করেই কংগ্রেসের কাছাকাছি আসার জন্য সিপিএম প্রচেষ্টা করেই চলেছে। তাই এখন আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, "কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট উভয় দলই হিন্দু বিরোধী হয়ে ভোট-ব্যাঙ্ক রাজনীতি করেই চলেছে এবং তোষণ নীতির জন্যই দেশের ক্ষতি হচ্ছে। দেশের মানুষ এদের চরিত্র দেখে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন দিলে দেশের অখণ্ডতা রক্ষা পাবে এবং হিন্দু ও মুসলমান অর্থাৎ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতীয় জাতীয় পতাকার নীচে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন।

—সৌমেন চক্রবর্তী, শিবপুর, হাওড়া।

ভারতের জনসংখ্যা ২০২৫-এ চীনকে ছাড়িয়ে যাবে

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

জনমত

সংবাদে প্রকাশ ২০২৫-এ অর্থাৎ আর ১৫ বছরের মধ্যেই জনসংখ্যায় চীনকে ছাপিয়ে যাবে ভারত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ চীন, জনসংখ্যা ১৩৩ কোটি। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেশ ভারত, জনসংখ্যা ১১৭ কোটি। অনুমান করা হচ্ছে ২০২৫ সালে চীনের জনসংখ্যা হবে ১৩৯ কোটি ৪ লক্ষ, কিন্তু ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১৩৯ কোটি ৬ লক্ষ। অর্থাৎ চীনের থেকে বেশী। কিন্তু কেন? কি কারণে?

অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপদ সম্পর্কে চীন সচেতন। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে চীন যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে শুধু নয়, সেগুলি কার্যকরী করতে কঠোর হতে দ্বিধা করছেনা। চীনে নাগরিকদের একাধিক বিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ। একাধিক সন্তানের পিতাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত, আর্থিক জরিমানা অথবা কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চীন সরকার কঠোর। তাই সেখানকার জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছেনা। অন্যদিকে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ার সুবাদে সংখ্যালঘুদের ধর্মাচরণে বা ধর্মীয় বিষয়ে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় না। ভারতে হিন্দুদের ক্ষেত্রে সরকারী স্লোগান "হম দো হামারা দো।" আর এদেশের সংখ্যালঘু তথা মুসলমানরা পরিচালিত হয় তাদের শরিয়তি আইন অনুসারে। এদেশের হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানতে তারা বাধ্য নয়। শরিয়তি আইন অনুযায়ী সংখ্যালঘুরা একসাথে চারটি বিবি রাখতে পারে। আসল উদ্দেশ্য অবশ্য ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা। বছর তিরিশ আগে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক হুমকি দিয়েছিলেন "ভারতে আমরা চিরকাল সংখ্যালঘু হয়ে থাকব না। আগামী পঞ্চাশ বছরে না হোক আগামী একশ বছরে আমরা ভারতে সংখ্যাগুরু হবই হব।" মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কার। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। তাই একাধিক শাদি, অধিক সংখ্যায় সন্তান উৎপাদন, ধর্মান্তরকরণ, অনুপ্রবেশ প্রভৃতি। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের প্রয়োজনই বা কোথায়? ১৯৪৭ সালে ১০ কোটি মুসলমান যদি ৩১.৫ কোটিরও বেশী হিন্দুর মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে পাকিস্তান আদায় করে নিতে পারে তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে ভারতের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। ইসলামি মতে সমস্ত পৃথিবীটা আল্লাহর সাম্রাজ্য। এই আল্লাহর সাম্রাজ্য যেখানে আল্লাহর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত নেই সেখানে আল্লাহর শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা একজন সাচ্চা মুসলিমের পবিত্র কর্তব্য। অর্থাৎ শুধুমাত্র ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশে ইস্‌লামিক শাসন প্রবর্তন করা প্রধান লক্ষ্য। আর এজন্য প্রয়োজন সারা পৃথিবীতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা যত সহজ সম্ভবত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তা নয়। কারণ ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ইসলামের বিধান অনুযায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ গুণাহ্। সুতরাং জন্ম নিয়ন্ত্রণ নৈব নৈব চ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের ৩০ মে কলকাতার উপকণ্ঠ বানতলায় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল সেটি স্মরণ করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা সেটি বিস্মৃত হইনি নিশ্চয়ই। দেখা যাচ্ছে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ মুসলমানদের অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় কারণ অবৈধ অনুপ্রবেশ। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে ভারতে অবাধে অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। ফলে কয়েক কোটি বাংলাদেশী এখন ভারতের নাগরিক বনে যাচ্ছে। এসব ছাড়াও ছোটখাট আরও কিছু ঘটছে। নেপাল থেকে গোর্খা জনজাতির কিছু কিছু লোক ভারতে এসে ডেরা বাঁধছে। এদের একটা অংশ তো দার্জিলিং-এ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার শক্তি বৃদ্ধি করছে। পাকিস্তান এবং আজাদ কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসীরা কাশ্মীরে আসছে, মিশে যাচ্ছে কাশ্মীরী উগ্রপন্থীদের মধ্যে। সব মিলিয়ে ভারতের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি। এর মধ্যে হিন্দু ৩০ কোটি, মুসলমান ৩.৫ কোটি এবং অন্যান্য ১.৫ কোটি। ২০১১ সালের জনগণনার কাজ চলছে। আনুমানিক জনসংখ্যা ১১৭ কোটি। এর মধ্যে হিন্দু ৯০ কোটি, মুসলমান ১৭ কোটি, অন্যান্য ১০ কোটি। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দু ৩ গুণ, মুসলমান প্রায় ৫ গুণ এবং অন্যান্য ৬ গুণ।

শুধু ভারত নয়। মুসলমানদের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক স্যামুয়েল হান্টিংটন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা ৩০ শতাংশতে পৌঁছবে। বিখ্যাত মুসলিম নেতা আলি মিএগা মুসলিম মহিলাদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন Muslim women should use their womb as a weapon to give birth too many children and make India a Muslim majority country as early as possible। ভারতে গ্রামেগঞ্জে মাওলানা, মওলভীরা মুসলিম মহল্লাগুলিতে এবং মসজিদে সমজিদে গিয়ে সভা করে প্রচার করে চলেছে

(এরপর ১৩ পাতায়)

ষোড়শ মহাজনপদ

কুরু

গোপাল চক্রবর্তী

ষোড়শ মহাজনপদের এই জনপদটি ছিল বর্তমান দিল্লীর নিকটে। আর্যদের একটি গোষ্ঠীর নাম ছিল কুরু, সম্ভবত তারাই এই জনপদের প্রতিষ্ঠাতা। পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে এবং চন্দ্রের পুত্র বুধের ঔরসে পুরুরবার জন্ম হয়। এই পুরুরবার বংশে পুরু, ভরত, কুরু প্রভৃতি

সুবিখ্যাত নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর বংশধরগণ তাঁর নামে কুরু বা কৌরব নামে পরিচিত হন। এফ. এ পার্জিটার কর্তৃক সংকলিত পৌরাণিক বংশলতায় বৈবস্বত মনু থেকে কুরু বংশীয় পরীক্ষিতের পিতা অভিমন্যু পর্যন্ত ৫৪টি নাম দেখা যায়। তন্মধ্যে সম্বরণ পুত্র কুরুর স্থান বত্রিশতম।

কথিত আছে রাজা কুরু আপন রাজধানী প্রয়াগ ত্যাগ করে সমন্তপঞ্চক তীর্থের নিকটে একটি মনোরম স্থানে বাস করতে থাকেন। এই স্থানটির নাম হয় কুরুক্ষেত্র। মহাভারতের কাহিনীকে এই কিংবদন্তির ভিত্তি বলা যেতে পারে। ঋগ্বেদে কুরুকুলের সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই, তবে কুরুশ্রবণ (১০.৩৩.৪) এবং পাকস্থানা কৌরয়াণ (৮.৩.২১) এই নাম দু'টিতে কুরুবংশ বা কুরুরাজ্যের ইঙ্গিত আছে। ঐতরেয় প্রমুখ ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও বহুবার পাঞ্চাল কুলের সঙ্গে কুরুগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরু ও পাঞ্চালরা যে তখন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে সরস্বতী নদীর উপত্যকা অঞ্চলকে কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ কুরুদের ভূমি বলা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয়ের রাজধানীর নাম আসন্দীবৎ বলা হয়েছে। কিন্তু মহাভারতে কুরুদেশের রাজধানী রূপে হস্তিনাপুর (বর্তমান উত্তর প্রদেশের মীরাট জেলার অন্তর্গত) এবং ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লীর নিকটবর্তী) এই নগর দুটির পরিচয় পাওয়া যায়। অসন্দীবৎ নগরের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। যাহোক বৈদিকোত্তর যুগে কুরুকুল বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে বিস্তৃত হয়েছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কুরু, পাঞ্চাল, বশ এবং উশীনর এই চারটি কুলকে মধ্যমাবিশ বা মধ্যদেশের অধিবাসী বলা হয়েছে। আবার কুরুকুলের একাংশ হিমালয় অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে উত্তরকুরু নামে খ্যাত হয়।

মহাভারতের বর্ণনায় দেখা যায় কুরু জনপদ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) কুরুদেশ (২) কুরুক্ষেত্র এবং (৩) কুরুজাঙ্গল। জাঙ্গল শব্দের অর্থ অনুর্বর জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি। মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে পরীক্ষিৎ ও জনমেজয় কুরুবংশীয়। পরীক্ষিতের সমগ্র পৃথিবী জয় করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু মুনির শাপে তাঁর সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে প্রতিশোধ নেবার জন্য পুত্র জনমেজয় সর্পকুলের বিনাশার্থে এক সর্পযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। এই যজ্ঞস্থলটি বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডি জেলার তক্ষশীলায়। বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য স্মরণ করলে সে যুগে রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলকে কুরুদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

পৌরাণিক কুরুবংশ লতিকায় বর্তমান মন্বন্তরের আদি নরপতি বৈবস্বত মনু থেকে অন্তিম নরপতি ক্ষেমক পর্যন্ত কুরু নৃপতিদের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে নিচক্ষু পর্যন্ত নৃপতিগণ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করেছিলেন। কথিত আছে নিচক্ষুর রাজত্বকালে গঙ্গার বন্যায় হস্তিনাপুর বিধবস্ত হলে তিনি বর্তমান এলাহাবাদ জেলার কৌশাম্বিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

মহাভারত অনুসারে কুরু বা কৌরবকুল বাহিনীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্রদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এই ভয়াবহ যুদ্ধে পূর্বে প্রাগজ্যোতিষপুর বা অসম এবং দক্ষিণে পাণ্ড্যদেশ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের নৃপতিগণ কোন না কোনও পক্ষে যোগদান করেছিলেন। কৌরবপক্ষে ১১ এবং পাণ্ডব পক্ষে ৭ অক্ষৌহিনী সৈন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। এক অক্ষৌহিনী সেনাদলে ২১৮৭০ রথ, ২১৮৭০ হস্তী, ৬৫৬১০ অশ্ব এবং ১০৯৩৫০ পদাতিক অর্থাৎ মাহুত ও সারথি সহ ২৬,২,৪৪০ জন লোক থাকত। সুতরাং ১৮ অক্ষৌহিনীতে ৪৭২৩৯২০ লোক থাকবার কথা। একটিমাত্র রণক্ষেত্রে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ, হস্তি ও অশ্বের সমাবেশ এক অকল্পনীয় ব্যাপার। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নিয়েও মতভেদ আছে।

কুরুরাজ দুর্যোধন যে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে গদাযুদ্ধে আহত হন তা বর্তমান থানেশ্বরে দেখান হয়ে থাকে। এর প্রায় ২৭ কিলোমিটার দক্ষিণে বাস্থলীকে বলা হয় প্রাচীন ব্যাসস্থলী। কিংবদন্তী থানেশ্বরের ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত আমীন নামক স্থানে অর্জুন-সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু নিহত হন। আর সেইখানেই অর্জুনের হাতে কৌরব পক্ষের সেনাপতি অশ্বত্থামা পরাজিত হয়েছিল। থানেশ্বরের প্রায় ১৩ কিঃমিঃ পশ্চিমে ভোর নামক স্থানে ভূরিশ্রবা এবং ১৮ কিঃমিঃ দক্ষিণ পশ্চিমে কুরুবীর ভীষ্ম দেহত্যাগ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে কুরুরাজ্যে কোনও শক্তিশালী শাসক না থাকায় এই রাজ্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এই জনপদ মগধের অধিকারে চলে যায়।

পরম্পরা

বরোদার কালিকামাতা

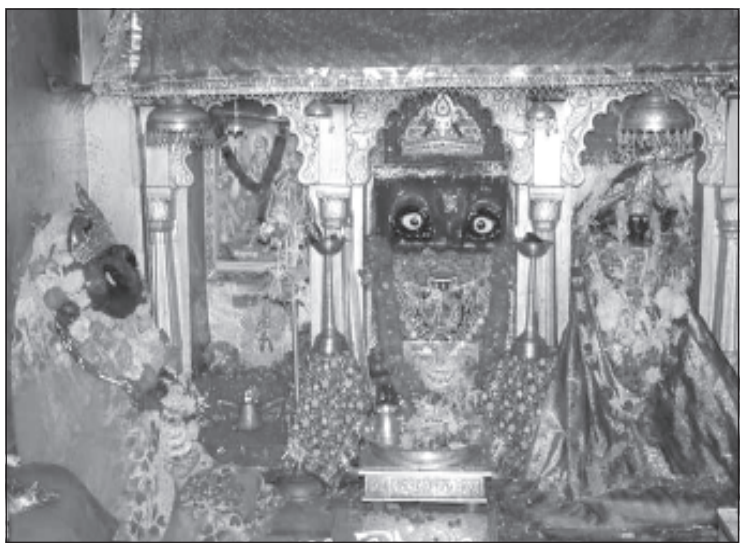

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গুজরাটের অন্যতম শহর হলো বরোদা। বরোদা থেকে বাস বা ট্যাক্সি ধরে মাত্র ৪৫ মিনিটের পথ চম্পেনার। পাহাড়ে ঘেরা একটা ছোট্ট শহর চম্পেনার। প্রকৃতি যেন তার সৌন্দর্যের সমস্ত রূপ মেলে ধরেছে এই শহরটার বুকে। চম্পেনারে পৌঁছে পাঁচ কিলোমিটার জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে পৌঁছাতে হয় পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি প্রাচীন

মন্দিরের প্রাঙ্গণে। সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৭৬২ কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থিত এই প্রাচীন মন্দিরটি। তবে জঙ্গলের পথে না যেতে চাইলেও মন্দিরটির প্রবেশদ্বারে যাবার জন্য খোলা আছে আরেকটি পথও। রোপওয়ে বা কেবল-কারের সাহায্যে সহজেই যাওয়া যায় মন্দিরটিতে। স্থানীয় মানুষদের কাছে মন্দিরটি কালিকা মাতার মন্দির নামেই পরিচিত। শুধু স্থানীয় মানুষজনের কাছেই নয়, মন্দিরটি মাহাত্ম্য হিন্দু সমাজের কাছেও যথেষ্ট। তাদের কাছে এটি মা কালীর একটি জাগ্রত মন্দির। সারা বছর সারা দেশ থেকে অসংখ্য ভক্তের ঢল নামে এই মন্দির প্রাঙ্গণে।

মন্দিরের সম্মুখে গেলে চোখে পড়বে একটি বৃহৎ দুর্গ ও একটি খোলা বারান্দা। বারন্দা সংলগ্ন দুটো পূজাবেদীরও সন্ধান পাওয়া যাবে, যেখানে মা-কালীর উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে চোখে পড়বে মা কালীর একটি প্রকাণ্ড লাল রঙের মুখ, যাকে বলা হয় মুখাওতো ছত্তত্তস্সড্ডব্রব্ধস্পগ্ন। এছাড়া মন্দিরের ভেতর দেখতে পাওয়া যাবে মা-কালীর সম্পূর্ণ মূর্তিও।

প্রাচীন শিল্পকলার ছোঁয়ায় নির্মিত এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠার কাহিনী নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অবসান না ঘটলেও, মন্দিরটি যে দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরা মোটামুটি একমত। তবে সৌন্দর্য শুধু মন্দিরটি ঘিরেই নয়, গোটা চম্পেনারই যেন প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্যের হাতে বন্দি। এই সৌন্দর্য বিকশিত হয় উৎসবের মরশুমে। সেই সময় গোটা মন্দিরটিকে সাজিয়ে দেওয়া হয় আলো দিয়ে। রোজ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খোলা থাকে মন্দিরের প্রবেশ দ্বার।

সামনেই কালীপুজো। তাই আর দেরী না করে আপনিও অনায়াসে চলে আসতে পারেন চম্পেনারে। জঙ্গলের রোমাঞ্চকর পথ অথবা রোপওয়ে বেড়ানোর মাধ্যমে প্রকৃতির সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে পারেন আপনিও। মা কালীর কাছে নিজের যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণার কথা নিবেদন করে সূচনা করতে পারেন নতুন জীবনের।

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

পরিবেশ রক্ষার পাঠ্যক্রম

নীল উপাধ্যায়

বিশ্ব-উষ্ণায়নের ফলে দিন-দিন একটু একটু করে বেড়ে চলেছে পৃথিবীর তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডলে ওজোন আস্তরণে দেখা দিয়েছে ছিদ্র। বিশ্বজুড়ে শিল্পায়ন ও নগরায়নের বৃদ্ধির ফলে বাড়ছে দূষণ, কমছে বনভূমি, জল ও অন্যান্য খনিজ সম্ভার। প্রগতির পেছনে ছুটতে গিয়ে মানুষ যথেচ্ছরূপে ব্যবহার করে চলেছে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ, যার পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে পরিবেশের ওপরই। ফলে মানুষ নিজেই নিজের অস্তিত্বকে তিলে তিলে বিপন্ন করে তুলেছে। তাই অনেকটা নিজেদের স্বার্থেই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বর্তমানে নানা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। যাতে পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আবার প্রগতিও থেমে না থাকে। এই সূত্রে স্কুলে তো বটেই, বিভিন্ন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েও এখন পরিবেশ নিয়ে নানান পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। এমনই একটা কোর্স হলো 'এন্‌ভায়রনমেন্টাল সায়েন্স।'

এদেশে খুব কমই কলেজ আছে যেখানে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স-এ স্নাতক পড়ানো হয়। সাধারণত বিষয়টি নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরেই পড়াশুনো করেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছভ্রভ্রভ্র.ন্দ৹ত্ত্বদ্রত্ত.ন৹গ্ন, পুণে বিশ্ববিদ্যালয় ছভ্রভ্রভ্র.ত্ত৹নক্ষ্মত্ত৹ন্দ্ব.ন্দ্বক্ত৹ন্দ্বব্ধ.ন৹গ্ন, টেরি বিশ্ববিদ্যালয় ছভ্রভ্রভ্র.ব্ধন্দ্বক্তন৹ত্তন্নন্দ্বক্ত-ব্দনব্ধত্তত্ত্ব.ন৹গ্ন-এ এই ধরনের কোর্স করানো হয়। সাধারণত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, ভূগোল, জিয়োলজি, মাইক্রো-বায়োলজি, এগ্রিকালচার বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতকরা আবেদন করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা, কল্যাণী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও এই কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছভ্রভ্রভ্র.ন্দ্রত্বক্ষ্মত্তক্তন্দ্ব.ন্দ্বত্তত্ত্বগ্ন এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ বিভাগে এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি, সিস্টেম মডেলিং-এর মতো কোর্স করানো হয়। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট (সিয়েস)-এ এক বছরের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট-এর পাঠক্রম আছে।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ২৫

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর ।।

পেঁয়াজ পুরাণ

প্রাচীন মিশরের মানুষ পেঁয়াজকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করতেন। এর গোলাকার সমকেন্দ্রিক ভাগের জন্য পেঁয়াজকে ঐক্যের প্রতীক জ্ঞানে তাঁরা পুজো করতেন। পাঁচ হাজার বছর পুরনো মূর্তি ও পাথরের গায়ে পেঁয়াজের চিহ্ন পেয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে ব্রোঞ্জ যুগেও পেঁয়াজের ব্যবহার ছিল। উত্তাল সমুদ্রে জাহাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নাবিকেরা গ্লাস-অনিয়ন ব্যবহার করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সময় জেনারেল ইউলিসিস গ্রান্ট সামরিক বিভাগে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল, পেঁয়াজ দিতে হবে, তাহলেই সেনা প্রত্যাহার করবেন। পেঁয়াজ দিয়ে তবেই রেহাই।

অঙ্কের ক্লাসে ছড়ি-হাতে পিঁপড়ে

গবেষকরা বলছেন, পিঁপড়েরা কঠিন-কঠিন অঙ্ক ঝট করে কষে দিয়ে মানুষকে লজ্জায় ফেলতে পারে। জীবনধারণের প্রয়োজনে মগজে অঙ্কের প্যাঁচ খেলিয়ে জটিল সমস্যার সমাধান বার করতে পিঁপড়েদের জুড়ি নেই। 'টাওয়ার্স অব হ্যানয়' নামের গোলকধাঁধার এক প্রান্তে খাবার আর অন্য প্রান্তে পিঁপড়েরা। পিঁপড়েরা খুব সহজেই গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে খাবারের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সেদিনের দেরি নেই, যখন অঙ্কের ক্লাসে মাস্টারমশায়ের চেয়ারে ছড়ি হাতে পিঁপড়েরা বসে ক্লাস নিচ্ছে।

সক্রেটিসের উপদেশ

এথেন্সের কারাগারে মহাজ্ঞানী সক্রেটিস অপেক্ষা করছেন প্রহরীর জন্য। নির্ধারিত সময়েই প্রহরী এল হেমলকপূর্ণ পাত্র নিয়ে। একপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে প্লেটো। ঘড়ির কাঁটা নিঃশব্দে সরে গেল। হিমেরাস পর্বতের চূড়ায় তাকিয়ে শেষবারের মতো সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে বিষপাত্র হাতে নিয়ে প্লেটোর দিকে তাকিয়ে সক্রেটিস বললেন, 'এই কথাটা ভুলো না, সময়নিষ্ঠাই মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি।'

বিলিতি বস্ত্রের জন্য

পরাধীন ভারতে বিলিতি বস্ত্র চালাবার জন্যে কোম্পানির লোকেরা বাংলার তাঁতিদের হাতের আঙুলগুলো ভেঙে অকেজো করে দিত।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

রঙ্গন ঃ এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিস কেন?

ড্রাইভার ঃ ব্রেক ফেল করেছে। অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আগেই বাড়ি পৌঁছতে হবে না!

* * *

বিমল ঃ কীরে, প্রেম করে তড়িঘড়ি বিয়ে তো করলি, আছিস কেমন?

কমল ঃ আর থাকা! যে আগে বল্‌তো তুমিই আমার ভ্যালেন্টাইন, সে এখন বলছে, জানো তো আছে ৪৯৮-এর আইন!

* * *

—সিপিএম তিন দশক ধরে রাজ্যের সব কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে এখন আবার শিল্প-শিল্প করছে কেন বল্‌তো?

—কেন আবার, বন্‌ধ ডাকতে আর কারখানায় তালা ঝোলাতে হলে শিল্পায়ন তো চাই!

* * *

প্রশ্ন ঃ তোর জন্মদিনে ভগবানের কাছে কী প্রার্থনা করলি?

উত্তর ঃ ভগবান সবার ভালো করুন, আমায় দিয়ে শুরু করুন।

* * *

নগেন ঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা নাকি খুব স্পষ্ট বক্তা?

খগেন ঃ এখন তো আরও হয়েছেন।

নগেন ঃ কী রকম?

খগেন ঃ শুনিসনি, খেলতে গিয়ে ঠোঁট কেটেছেন!

—নীলাদ্রি

ম গ জ চ র্চা

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০-এর দশক থেকে বস্তুটি 'স্টেডিয়াম ইন' নামে বিক্রি হয়ে আসছে। ২০১০ সালে সেটি দুনিয়ার নজর কাড়ে অন্য নামে। নামটি কী?

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি হিসেবে কারা পরিচিত ছিল?

৩। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর কৌরবদের সেনাপতি হন কে?

৪। মাইকেল মধুসূদন একটি ছদ্মনাম নিয়ে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফেরেন জাহাজে। কী ছদ্মনামে, কোন্ জাহাজে ফেরেন?

৫। কোন্ স্কুলের ছাত্রদের ডাক নাম 'ডস্‌কোস'?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। ভুভুজেলা
২। আমেরিকা, বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়া
৩। অশ্বত্থামা
৪। মিঃ হোল্ট; বেন্টিঙ্ক
৫। দেরাদুন 'দুন' স্কুলের

নবজাগরণ রথযাত্রা উপলক্ষে শহীদ মিনারে জনসমুদ্র

পরিবর্তনের আহ্বান বিজেপি নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "অনেক হয়েছে আর নয়। এবার পশ্চিমবঙ্গকে মার্কসবাদী দলের শাসন থেকে মুক্তি দেওয়ার সময় এসে গেছে। আর বরদাস্ত করা চলবে না। এখন ফেব্রুয়ারি মাস। আমি আপনাদের কলকাতায় এসেছি। আবার 'মে' মাসের পরে কখনও আসব। তখন যেন এখানে মার্কসবাদী দলের শাসন দেখতে না হয়। অন্য কারও শাসন হবে। এই নবজাগরণ যাত্রার শ্রেয় রাজ্য সভাপতির। আজকের বিশাল জনসভা, আপনাদের উৎসাহ পরিবর্তনের দ্যোতক হোক। এটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ।"

উপরোক্ত বক্তব্য ভারতের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর। তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি'র নবজাগরণ রথযাত্রার (কুচবিহার থেকে কলকাতা) সমাপ্তি উপলক্ষে কলকাতার সর্বজন পরিচিত শহীদ মিনার ময়দানে এক জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন। তিনিই ছিলেন এদিনকার সভার শেষ বক্তা। তিনি আরও বলেন, তিনি যখন সংসদে প্রথম নির্বাচিত হন তখন তাঁর দল ছোট। আর মার্কসবাদীদের প্রভাব ক্ষেত্র পৃথিবী জুড়ে ছিল। এখন তো মার্কসবাদের আদর্শ কালবাহ্য হয়ে গিয়েছে, কোনও ভবিষ্যৎ নেই। এখন গণতন্ত্রের যুগ, আগামীদিনও গণতন্ত্রের। মার্কসবাদীদের থেকেই মাওবাদী হিংসার উদ্ভব। নেপালে যার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। শ্রী আদবানী তাঁর দলের মুখ্যমন্ত্রীদের কাজের ভুরি ভুরি প্রশংসা করেন। এদিকে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংকে 'ভালো অথচ দুর্বল' বলে আখ্যা দিয়ে বলেন, একারণেই ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতির রমরমা ঠেকানো যাচ্ছে না। সবাইকে তিনি আর একবার স্বাধীন ভারতে অমর শহীদ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেন। বাংলাতেও বিজেপি-কে প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানান।

বস্তুত এদিনকার সভায় বক্তা ও নেতাদের উপস্থিতির তালিকা বেশ দীর্ঘ। কেন্দ্রীয় নেতারা যেখানে কেন্দ্র সরকার ও মার্কসবাদদের তীব্র সমালোচনা করেন সেখানে রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা এবং অন্যরা রাজ্যের শাসক বামফ্রন্ট ও বিরোধীদল ও দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীর তীব্র সমালোচনা করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন চার মুখ্যমন্ত্রী— ইয়েদুরাপ্পা, ডঃ রমণ সিং, অর্জুন মুণ্ডা এবং ডঃ রমেশ পোখরিয়াল। এছাড়া, সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন গডকরি, অরুণ জেটলি (রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা), রাজনাথ সিং, চন্দন মিত্র, তথাগত রায়, রাহুল সিনহা, বাদশা আলম ও অসীম সরকার ও প্রভাকর তেওয়ারি। সভা পরিচালনা করেন শমীক ভট্টাচার্য এবং ধন্যবাদ জানান রাজ্য সহ-সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায়।

বর্তমান বাংলা ও বাঙ্গালী

(৮ পাতার পর)

সমাজের যে অংশ ভুল বোঝাবুঝির ফলে উচ্চবর্ণের অত্যাচারে অপমানে স্বধর্ম পরিত্যাগ করেছিল, প্রীতির টানে বৈষ্ণবপ্রেমে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁদের মধ্যে ইচ্ছুক অংশকে পুনরায় সনাতন ধর্মে ফিরে আনার ব্যবস্থা করা যেত, তবে বাংলা ভাগই হয় না। পূর্ববঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালী জমিদাররা তাদের উচ্চ সামাজিক অবদানকে নিষ্ঠার সাথে কাজে লাগালে সেদিন এ কাজ অসম্ভব ছিল না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আর্য সমাজের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে যেমন "শুদ্ধি আন্দোলন" শুরু হয়েছিল বঙ্গদেশে আমরা সেরূপ আন্দোলন করতে পারিনি। আন্দোলন প্রিয় হিন্দু বাঙ্গালীর এখানে ঘাটতি ছিল বলে সাহেবরা সেখানেই আঘাত করেছে। আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষরা সমাজের মাথা হলেও সমাজদেহের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন যে কি কি কারণে স্বাধীনতার ও দেশভাগের মাত্র ৭৫ বছর আগে হিন্দু বাঙ্গালী অখন্ড বঙ্গ দেশে সংখ্যালঘু হয়ে গেল। হিন্দু বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা একটু চোখ খুলে সমাজে চললে ও স্বধর্ম রক্ষার কাজে সচেষ্ট হলে হয়ত সমাজচিত্রটা অন্য রকম হোত। একদিকে হিন্দু বাঙ্গালী ভদ্রসম্প্রদায় সাহেব ঘেঁষা শিক্ষা নিয়ে মেতে রইলেন আর অন্যদিকে সমাজের বেশীরভাগ অংশই আমাদের হাতের বাইরে চলে গেল।

শ্রীচৈতন্যদেব চেষ্টা করেছিলেন ও সফল হয়েছিলেন হিন্দু বাঙ্গালীর সংকট আটকাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলন সফল হয়েছিল শিক্ষিত হিন্দু বাঙ্গালীকে তার ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে। কিন্তু এ সবই পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত হয়েছিল, পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে এর স্পর্শ পৌঁছে দিতে সাধারণ হিন্দু বাঙ্গালীর যে নিষ্ঠার অভাব ছিল সে কথা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

হিন্দু বাঙ্গালীর এই উদাসীনতার ঐতিহ্য স্বাধীনতার পরও সমানে চলেছে। অখণ্ড বঙ্গের ৬৭ শতাংশ জমি হারিয়ে ৩৩ শতাংশ জমি নিয়ে যে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হলো সেখানে ৮০ লাখের বেশী বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়েছে। সারা দেশে বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। উন্নয়ন সম্ভব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হলে— শুধু তর্কে আর্থিক উন্নয়ন অসম্ভব। ভোটের স্বার্থে লাগামহীন অনুপ্রবেশকে সমর্থন করে আর কলকাতায় দাঁড়িয়ে উন্নয়নের পক্ষে ওকালতি করলেই উন্নয়ন হবে কি? আর দেশটাই হিন্দু বাঙ্গালীর হাতের বাইরে চলে গেলে সে উন্নয়নে হিন্দু বাঙ্গালীর দুর্দশা ঘুচবে কি?

স্বাধীনতার পরে শুধু মুর্শিদাবাদ মুসলমান প্রধান জেলা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কারণ হিন্দু প্রধান খুলনা গিয়েছিল পূর্ববঙ্গের ভাগে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর ৬৪ বছরে দেখা গেল মুর্শিদাবাদে হিন্দুর জনসংখ্যা ৪৫ শতাংশ থেকে কমে প্রায় ৩৫ শতাংশ আর খুলনায় হিন্দু তার গরিষ্ঠতা হারিয়ে প্রায় অন্তর্জলি যাত্রার পথে। এর সঙ্গে আরও ভয়াবহ খবর হলো মালদা তার হিন্দু গরিষ্ঠতা হারিয়ে দ্বিতীয় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে দ্বিতীয় বার উদ্বাস্তু হবার জন্য তৈরি হওয়া ভালো। সেদিনও ভদ্র হিন্দু বাঙ্গালীর উদার মনোভাব হিন্দু বাঙ্গালীকে বাঁচাতে পারেনি। আগামীদিনেও হিন্দু বাঙ্গালীকে তথাকথিত স্বনামধন্য হিন্দু বাঙ্গালী ভদ্রলোকরা বাঁচাতে পারবে না যদি না হিন্দু বাঙ্গালী সচেতনভাবে দেশ রক্ষায় ব্রতী হয়।

বামশাসনে ধ্বংস হয়েছে মানুষের সততা

(৯ পাতার পর)

মনে হয়, দেশ স্বাধীন হবার পর একটা বিরাট রাজনৈতিক গোষ্ঠী আচমকা ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেল। আদর্শ-টাদর্শ ভুলে গিয়ে তারা সেই ক্ষমতাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চাইলো। দেশের মানুষের এতে কোনও লাভ কিন্তু হলো না। মূল বিপর্যয়টা এভাবেই শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বলবো দেশ ভাগের পর এখানে যে বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছিল, মানবিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবনা নিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়নি।

❑ এর জন্য তৎকালীন দেশের শাসকদলকে দায়ী করতে চাইবেন?

● শুধু শাসক দল নয়। তৎকালীন প্রতিটা রাজনৈতিক দল, মানে বলতে চাইছি যে দলগুলো ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার জন্য প্রতিযোগিতায় নামে তাদের প্রত্যেকেই এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবনমনের জন্য দায়ী। রাজনীতি কলুষিত হওয়ার সূচনা তখনই।

❑ প্রায় একযুগ আগে আপনার 'অদ্ভুত আঁধার' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। নন্দীগ্রাম বা সাম্প্রতিক নেতাই গ্রামে যে আঁধার আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, আপনি তার আঁচ এত আগে পেলেন কি করে?

● দেখ, শিল্পী-সংস্কৃতি কর্মীরা অনেক বিষয়ের আঁচ অনেক আগে থেকেই পান। কেউ প্রকাশ করেন, কেউ প্রকাশ করেন না। শিল্পী হিসেবে তখনই মনে হয়েছিল যা অনুভব করছি, যা আঁচ পাচ্ছি, যা বুঝতে পারছি তা জনসমক্ষে তুলে ধরা দরকার। ঠিক সেটাই করেছি।

❑ শিক্ষা-প্রসঙ্গে যে কথাগুলো এতক্ষণ বললেন তাতে আপনার 'জগা-খিচুড়ী' নাটকের কথাটা বারবার পাঠকের স্মরণে আসতে বাধ্য।

● এখন তো প্রায় প্রতিদিনই দূরদর্শনে ঢাক-ঢোল পেটানোর বিজ্ঞাপন দেখি যাতে করে মনে হতে পারে যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ বামরাজত্বে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রাজ্যে পরিণত হয়েছে। অন্তত বিজ্ঞাপনের সুবাদে তাই মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। অথচ বাস্তব চিত্রটা কত করুণ আমরা সকলেই তা জানি। 'জগা-খিচুড়ী' নাটকে সেই কথাগুলোই বলতে চেয়েছি।

❑ সংরক্ষণের রাজনীতি আপনার কাছে কতটা সমর্থনযোগ্য?

● (একটু ভেবে) আসলে এটা খুবই জটিল প্রশ্ন। এটা ঘটনা যে কিছু মানুষ ঐতিহাসিক কারণেই পিছিয়ে পড়াদের দলে রয়েছেন। তাদের উন্নয়নের জন্য অবশ্যই কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তবে তার বিজ্ঞানসম্মত পন্থা কি হবে তা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। কারণ সংরক্ষণ-ব্যবস্থা চালু হবার পর কিছু পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নতি যে হয়নি তা নয়। তবে এর কিছু বিরূপ প্রভাবও তো আমরা লক্ষ্য করেছি। সুতরাং সংরক্ষণ ভাল কি খারাপ সেটা এককথায় বলা খুব মুশকিল।

❑ কিন্তু সংরক্ষণ যদি রাজনৈতিক দলগুলোর হাতিয়ার হয়ে ওঠে তাতে আখেরে দেশের কোন লাভটা হবে?

● লাভ তো হবেই না। তবে সেটা শুধু সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই নয় সবকিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন ধরো, দেশে তো অনেক আইন রয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ সুরক্ষা পায়, প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার পায়। আবার সেই আইনের সুযোগ নিয়েই মানুষ দুর্নীতি করে, আইনের ফাঁক বের করে দুর্নীতি করে। সুতরাং আইনের প্রয়োগ এদেশে সঠিকভাবে হচ্ছে একথা বলা কি ঠিক হবে?

❑ একটা এস এম এস প্রায় প্রত্যেকের ইনবক্স ভর্তি করে ফেলেছিল যে ভারতে এখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্থাৎ পেঁয়াজ, আরাম অর্থাৎ ডিজেল এবং ফুর্তি অর্থাৎ বিয়ার একই দামে (৬৫ টাকায়) বিকোচ্ছে। একজন নাট্যকারের ব্যক্তিজীবনে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব কতটা পড়ে?

● সাধারণ মানুষের জীবনে মূল্যবৃদ্ধির যতটা প্রভাব পড়ে আমাদের জীবনেও ততটাই পড়ে। সাধারণ মানুষের ওপর, দারিদ্র্য-সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে দিনের পর দিন ভার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ আধবেলাও খেতে পায় না। এর জন্য শিল্পী, বুদ্ধিজীবী কিছু হবার দরকার নেই। তাদেরও তো বাজার করতে হয়। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারটা আমরাও টের পেতে বাধ্য। এই যেমন শীত এলে আমরা তা অনুভব করতে পারি, সেই সাথে এটাও মনে হয় বহু দরিদ্র মানুষ আছে যাঁরা ফুটপাতে খোলা-আকাশের নিচে লেপ-কম্বল ছাড়াই দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন।

❑ এই মুহূর্তে রাজ্যের প্রধান তিনটি সমস্যা চিহ্নিত করতে বললে কোন্ কোন্ সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে চাইবেন?

● এটা বলা খুব মুশকিল। একটা কথা আছে না— সাপ এত জায়গায় দংশন করেছে, কোথায় তাগা বাঁধবো জানি না। সবচেয়ে বড় জিনিস মানুষের সততা, মূল্যবোধ, মানবিকতা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। এর চাইতে মারাত্মক জিনিস আর কিছু হতে পারে না। এর থেকে পশ্চিমবঙ্গ-বাসী কি করে পরিত্রাণ পাবে জানি না।

❑ এই অক্টোপাস থেকে পশ্চিমবঙ্গ-বাসীকে মুক্তি দিতে আপনাদের ভূমিকা কিছু নির্ধারণ করেছেন?

● আমরা তো ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র, প্রান্তিক। আমরা সমাজকে কখনও প্রভাবিত করতে পারি না। রাজনীতিকে তো নয়ই। দরকার সুযোগ্য নেতৃত্বের। যে নেতৃত্ব দেশের মানুষকে সঠিক পথ দেখাবেন।

❑ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই ধরনের নেতৃত্ব আসবে বলে মনে করেন?

● অদূর ভবিষ্যতে অন্ততঃ নয়।

ভারতের জনসংখ্যা

(১০ পাতার পর)

জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা গুনাহ্, মহাপাপ। ইন্তেকালের পর দম্পতির বিশেষ করে বিবিটির নিশ্চিত দোজখে যেতে হবে। মুসলমানদের স্লোগান— যত পার সন্তান উৎপাদন কর। ফলশ্রুতি ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিশেষতঃ ভারতে। তাই ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি চীনকে ছাপিয়ে যাওয়া আশ্চর্যের নয়।

বিদ্যাবিকাশ পরিষদের রবিপ্রণাম ও শিশু-বিচিত্রা

বক্তব্য রাখছেন পদ্মশ্রী বরুণ মজুমদার। পিছনে বিজয়গণেশ কুলকার্ণী, ধ্রুবকুমার মুখার্জী, জগবন্ধু মহন্ত ও সাধন মজুমদার।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এসময়ে আমাদের দেশের জাতীয় সংহতি দারুণ বিপদের সম্মুখীন। এখনই প্রয়োজন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ ও আদর্শের। তিনি নিজে ব্রাহ্ম হয়েও হিন্দুদের সবকিছুতে সদাসর্বদা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এই বক্তব্য 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত বেতার সাংবাদিক বরুণ মজুমদারের। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি সভাগারে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ আয়োজিত 'রবি-প্রণাম' অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

এদিন হাওড়া মহানগর ও হুগলী জেলার বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ (বিদ্যাভারতী'র পশ্চিম মবঙ্গ শাখা) পরিচালিত বিভিন্ন শিশুমন্দিরের শিশু ভাইবোন ও আচার্য-অচার্যারা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। কয়েকশত ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, হাওড়াবাসীরাও অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে আলোকপাত করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়। বিদ্যাভারতী'র আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিদ্যাভারতীর সর্বভারতীয় কর্মকর্তা (সংস্কৃতি ও সংস্কৃত বিষয় প্রমুখ) বিজয়গণেশ কুলকার্ণী। তিনি বলেন, বিদ্যাভারতী'র মাধ্যমে সারা দেশে ২৫ হাজার বিদ্যালয় চলছে। সেখানে দেড় লক্ষাধিক আচার্য-আচার্যা কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষার অনুশীলন করাচ্ছেন। পশ্চি মবঙ্গে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের কাজ সম্পর্কে সকলকে অবগত করান পরিষদের রাজ্য সভাপতি ডঃ সাধন কুমার মজুমদার।

শিশুবিচিত্রা অনুষ্ঠানে শিশু কচিকাঁচাদের নৃত্য-গীতি আলেখ্য, যোগাসন, পিরামিড, হাস্যকৌতুক ও 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্য-গীতি-আলেখ্য সবার মনোরঞ্জন করে। মঞ্চে বৈদিক গণিতের অনুশীলন ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুরাই মঞ্চ স্থ অতিথিদের বরণ করে নেয়। এদিন পাঁচজন আচার্য-আচার্যাকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আচার্য পীযূষকান্তি বসু। শেষে ধন্যবাদ জানান রাজ্য সম্পাদক অনির্বাণ নিয়োগী। স্বাগত ভাষণও ছিল চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী ইশিকা নন্দীর।

শব্দরূপ - ৫৭২

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	১	২		■	৩	■	■
■	■		■	■	৪		৫
৬	■	৭		৮		■	
৯			■		■	■	
	■	■	১০	■	১১		
	■	১২				■	
১৩			■	■		■	■
■	■		■	১৪			■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. পুণ্যসলিলা এই পৌরাণিক নদীর তীরেই অযোধ্যা, ৪. স্নেহ-সম্বোধনে বাছা, ৭. রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার বীর পুত্র, ৯. এর ভিতরে পান-গাছের চাষ হয়, ১১. প্রচুর, যথেষ্ট, ১২. রাবণের অস্ত্র যার আঘাতে লক্ষ্মণ হতপ্রায় হয়েছিলেন, ১৩. তুষার, হিমানী, ১৪. প্রভাতী।

উপর-নীচ ঃ ২. অসুর বিশেষ যার একবিন্দু রক্ত মাটিতে পড়লে আর একটি ওইরূপ অসুর জন্মাত, ৩. অবিকল, যথাযথ, ৫. যে শপথ করেছে যে জয়লাভ বা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করবে, ৬. কুবেরের মা;রাবণের সৎমা, ৮. বাহুর অলংকার, ১০. ঝিনুক, ১১. বালি সুরকি চুন সিমেন্ট ইত্যাদির লেপ ১২. "এসেছে—, হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে।"

সমাধান শব্দরূপ - ৫৭০

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী

কলকাতা-৭০০০০৯

■	চো	■	শি	■	বা	র্তা	কু
■	পা	ং	শু	■	ম	■	ল
প	■	■	পা	লা	ন	■	কু
র	সা	ত	ল	■	■	■	ণ্ড
মু	■	■	■	প	ত	ঞ্জ	লি
খা	■	শি	খ	ণ্ড	■	■	ণী
পে	■	বি	■	শ্র	মি	ক	■
ক্ষী	রি	কা	■	ম	■	থ্ব	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৭২ সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ মার্চ, ২০১১ সংখ্যায়

টেলিছবি 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ'

মিতদ্রু দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবানুরাগী ও ভক্তদের জন্য সুখবর। শ্রী রামকৃষ্ণদেবের পূর্ণাঙ্গ জীবন ও কর্মের নানা দিক নিয়ে নির্মিত হচ্ছে টেলিছবি 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ'। তাঁর বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবন-এর নানা ঘটনা বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে দেখানো হয়েছে ছবিতে। মোট ২২টি পর্বকে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে স্টেট অফ দি আর্ট ভিডিও প্রযুক্তির সাহায্যে। টেলিছবিতে বেলুড়মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন সেবাকার্য তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে বন্যা, ভূমিকম্প সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে কিভাবে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে শুধু মাত্র একটি মন্ত্রকে সম্বল করে। সে মন্ত্রশক্তির অনিবার্য নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ নাম'। সে মন্ত্রশক্তিকে সম্বল করেই গড়ে উঠছে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। দেখানো হয়েছে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আদরের মা-কে কিভাবে পরম যত্নে খাইয়ে দিচ্ছেন মিষ্টি। কখনও আবার গিরিশ ঘোষের নাটক দেখতে গিয়ে নাট্যাচার্যের রোষের কোপে পড়ে শুনতে হচ্ছে 'ভণ্ড তপস্বী'র দুর্নাম। তাঁকে ডালপুরি-আলুরদম খেতে দিয়েও মদ্যপ গিরিশ ঘোষ তাঁর হাত থেকে সে খাবার কেড়ে নিয়ে তাঁকে থিয়েটার থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তবু ঠাকুর সর্বংসহা। মুখ বুজে সব সয়ে হেসে বলছেন, 'খেতে দিলিনি'। কাঁদছেন আর ফিরে যাচ্ছেন নিজ বাসগৃহে। নটীবিনোদিনী তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার মুহূর্তটিও যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। 'থিয়েটারে লোকশিক্ষে হয়'— এই মহান উক্তিটিও সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ছবিতে। এসেছে অনিবার্যভাবে মা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ। কথামৃত-এর রচয়িতা শ্রীম প্রসঙ্গে নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনাও রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে

তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী সর্বলোকানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ, অধ্যাপক হোসেনুর রহমান সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষজন।

সানরাইজ মিডিয়া ও স্পন্দন-এর যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই টেলিছবিটি যুগ্ম পরিচালনা করেছেন রাজীব রায় ও অর্ণব দত্ত। অভিনয়ে আছেন সৌরভ দত্ত (শ্রীরামকৃষ্ণদেব), বোধিসত্ত্ব মজুমদার (বিবেকানন্দ), অনুরাধা রায় (সারদা মা)। অন্যান্য চরিত্রে আছেন চৈতালী ঘোষাল, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লব ঘোষ, উৎপল রায়, সুমিতা দেব প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনা দেবাশিস রায়ের। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন মান্না দে, লতা মঙ্গেশকর, ইন্দ্রানী সেন, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত (সংস্কৃত-মন্ত্রপাঠ), পূর্ণচন্দ্র দাস বাউল, ইন্দ্রনীল সেন প্রমুখ। পরিচালকদ্বয় রাজীব রায় ও অর্ণব দত্ত জানালেন, আজকের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করাতেই তাদের এই প্রয়াস। আধ্যাত্মিক চেতনা ও ভারতীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দিতেই এ ছবি। বাংলায় এ ধরণের গবেষণার কাজ এই প্রথম। দেশ-বিদেশে ইতিমধ্যেই মিলেছে প্রশংসা ও পুরস্কার। পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির রাহুগ্রাস থেকে এই দেশের যুব সম্প্রদায়কে মুক্তির সঠিক পথ দেখাতে পারে এ ছবি।

পরলোকে সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

চলে গেলেন বর্ধমান জেলার পাঁচড়া গ্রামের সব্যসাচী চ্যাটার্জী। গত ৮ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজার দিন সকালে তিনি নিজগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। স্ত্রীসহ তাঁর দুই পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনি বর্তমান। উল্লেখ্য, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুব্রত চট্টোপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রচার প্রমুখ হিসাবে সঙ্ঘের দায়িত্ব পালন করছেন। কনিষ্ঠ পুত্র সঙ্ঘের দায়িত্বের পাশাপাশি বর্ধমান বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের আচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

পরলোকে সুন্দরলাল সোনী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের লক্ষ্ণৌ প্রবাসী কলকাতা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক গত ৬ জানুয়ারি ২০১১, হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভূপাল বাসগৃহে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮।

সোনী পরিবার সঙ্ঘময়। তাঁর বড় দুই ভ্রাতা স্বর্গীয় অনন্তলাল সোনী ও স্বর্গীয় বংশীলাল সোনী আজীবন সঙ্ঘ প্রচারক ছিলেন ও মাত্র কিছুকাল আগেই গত হয়েছেন। সুন্দরলালও আজীবন স্বয়ংসেবক ও কলকাতায় দায়িত্ববান কার্যকর্তা ছিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে তিনি সপরিবার লক্ষ্ণৌতে যান এবং সেখানেও ব্যবসায়ের সাথে সাথে সঙ্ঘ কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এর একটি নগরের সঙ্ঘচালক ছিলেন। সঙ্ঘের সমস্ত রকম শারীরিক কার্যক্রমে তাঁর বিশেষ রুচি ছিল। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা, নতি নাতনি, বহু গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবকসহ অসংখ্য ব্যক্তিকে রেখে গেছেন।

□ □ □

১৭ জানুয়ারি গঙ্গাজলঘাটি খণ্ড প্রচারক ভগবান মাহাতোর পিতৃদেব দশরথ মাহাতো ৭১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি পুরুলিয়া জেলার রাজাপলা গ্রামের বাসিন্দা। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র এবং স্ত্রী, নাতি-নাতনি রেখে যান।

□ □ □

গত ২৭ জানুয়ারি বাঁকুড়া নগরের প্রভাত শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক হরিদাস ধীবর পরলোক গমন করেছেন। ৩ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া সঙ্ঘকার্যালয়ে স্মরণ-সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তার স্মৃতিচারণ করেন। রেখে গেছেন তিন কন্যাসহ অনেক গুণমুগ্ধ বন্ধুকে।

□ □ □

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর। তিনি দুই পুত্র, এক কন্যা এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু রেখে গেছেন।

□ □ □

চলে গেলেন আদ্যাপীঠের সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্য মধুসূদন মুখার্জীর মাতৃদেবী কমলা মুখার্জী। গত ৭ ফেব্রুয়ারি ভোরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিন পুত্র, তিন কন্যা সহ তাঁর নাতি-নাতনিরা বর্তমান।

দিদির বেড়ালে আগমন

নটরাজ ভারতী

দিদি আসছেন। শরতকালে যেমন মা আসেন। আগে আশ্বিন মাস শুরু হলেই আমার দাদু জিজ্ঞাসা করতেন— দেখতো ভাই— এবার মা কিসে আসছেন। পাঁজি দেখতাম। মা কোন্ বছর কিসে আসছেন পাঁজিতে লেখা থাকে। দেখে দাদুকে বলতাম। গজে অথবা দোলায়। ঘোড়ায় অথবা নৌকায়। দুর্গা কিসে আসছেন জেনে নিয়ে দাদু তার ফল বলতেন। গজে আসছেন দেবী। শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা। ভালো ফসল হবে।

শরত নয় বসন্তও নয়। ভরা গ্রীষ্মে

> **দিদির আগমনধ্বনি যারা শুনতে পাচ্ছেন তাদের কাছে দুটি আওয়াজ এখন অত্যন্ত স্পষ্ট। আগমন পথে বহু আগে যেমন শব্দ পাওয়া যায়, তেমনই দিদির আগমনপথে শোনা যাচ্ছে মাওমাও এবং মিঞাও মিঞাও। সাধারণ বেড়ালের ডাক যদি ম্যাঁও ম্যাঁও হয় তবে মাও মাও নিশ্চিন্তে হুলো বেড়াল। আর মিঞা মিঞা হলো জঙ্গলী বনবিড়াল। দিদি আসছেন এই দুই বেড়ালবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। মাও ডাকের হুলো বেড়াল আর মিঞা ডাকের জঙ্গী বুনো বেড়াল। সুতরাং দিদির বেড়ালে আগমন।**

দিদি আসছেন দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন। সর্বত্র এখন একই আওয়াজ। দিদি আসছেন। দুর্গাপুজোর আগে যেমন পুজো পুজো গন্ধ পাওয়া যায় তেমনই দিদি আসার আগে বেশ উগ্র এবং উৎকট গন্ধ। সুতরাং দিদি আসছেন।

দিদি গজে আসছেন না। সে স্থিরতা ও গজগামিনী দিদি নয়। ঘোর গ্রীষ্মে নৌকোতে নয়, দোলাতেও নয়। অশ্বের যুগ শেষ। তাহলে দিদি কিসে আসছেন?

দিদির আগমনধ্বনি যারা শুনতে পাচ্ছেন তাদের কাছে দুটি আওয়াজ এখন অত্যন্ত স্পষ্ট। আগমন পথে বহু আগে যেমন শব্দ পাওয়া যায়, তেমনই দিদির আগমনপথে শোনা যাচ্ছে মাওমাও এবং মিঞাও মিঞাও। সাধারণ বেড়ালের ডাক যদি ম্যাঁও ম্যাঁও হয় তবে মাও মাও নিশ্চিন্তে হুলো বেড়াল। আর মিঞা মিঞা হলো জঙ্গলী বনবিড়াল। দিদি আসছেন এই দুই বেড়ালবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। মাও ডাকের হুলো বেড়াল আর মিঞা ডাকের জঙ্গী বুনো বেড়াল। সুতরাং দিদির বেড়ালে আগমন।

বেড়ালকুল অত্যন্ত ধূর্ত। সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সুযোগ পেলেই দাঁত নখ বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাওবাদীরা তাই করেছে। যথেচ্ছ হিংস্রতা, দেদার খুন, একটু সুযোগ পেলেই হলো। এদের হিংস্রতার বলি শিশু মহিলা সকলেই। দিদি এদের সমর্থক এবং অবশ্যই অন্যতম মদতদাতা। মাওবাদী হিংস্রতা অথবা তাদের আদর্শ নিয়ে দিদি নীরব। বাড়ির অ্যাকোরিয়ামে যেমন নানা রঙের নানা সাইজের মাছ থাকে দিদির চারপাশেও এখন নানা রঙের বুদ্ধিজীবী। লেজ নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা মাঝে মাঝে দল বেঁধে যাচ্ছেন। ফিরে এসে প্রভুকে রিপোর্ট দিচ্ছেন। দিদি গদগদ। তিনি ফুঁসে উঠছেন। ময়দায় ময়াম যত বেশী, ফোলে তত বেশী। বুদ্ধিজীবীদের ময়ামে তিনি ফুলে ফুলে উঠছেন।

হিংস্রতায় পিছিয়ে নেই দিদির মিঞা বাহিনীও। পুজোর আগে দিদি আশ্রিত মিঞা বাহিনী হিন্দুদের উপর নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছে চব্বিশপরগণার দেগঙ্গায়। বহু পুজো বন্ধ হয়েছে। দিদির মুখে টুঁ শব্দ নেই। কারণ এর পিছনে তারই লালিত পালিত মিঞা বাহিনী। দিদির অ্যাকোরিয়ামে থাকা বুদ্ধিজীবীদের মুখেও টুঁ-শব্দ নেই। ভাবটা এমন যেন মিঞারা হিন্দু মেরেছে ক্ষতিটা কি! ওদের উপর ভর দিয়েই দিদি আসছেন। ওদের কিছু বোলো না প্লিজ।

দিদির বেড়ালে আগমন। ফল আতঙ্ক। দাদু যেমন বলতেন মা দোলায় আসছেন— ফল মড়ক। মাও আতঙ্ক আর মিঞা আতঙ্কে দিশাহারা আমরা। দিদি এলে এদের দাঁত নখ আরও বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় সে লক্ষণ স্পষ্ট।

দিদির প্রধান দুই সঙ্গী মৌলবাদী, মাও এবং মিঞা। প্রথমটি রাজনৈতিক মৌলবাদী। দ্বিতীয়টি ধর্মীয় মৌলবাদী। একটি হুলো বেড়াল। অন্যটি বুনো বেড়াল। উভয়ের মধ্যে অদ্ভুত মিল। মাওদের ধারণাতে পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত। সর্বহারা আর পুঁজিবাদী। সব পুঁজিবাদীকে সর্বহারা করা মাওদের একমাত্র লক্ষ্য। দিদি কোন গোত্রের। পুঁজিপতি না সর্বহারা। জানা নেই। মিঞা ভাবনাতেও পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত। মুসলমান ও অমুসলমান। সব অমুসলমানকে মুসলমান করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দিদি অনেকটা এগিয়ে গেছেন এ পথে। নিজে ফেজ লাগান। ঘনিষ্টজনদের পরান। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নামাজও পড়েন। দিদি ক্ষমতায় এসে সব পশ্চিমবঙ্গবাসীর রোজা রাখা, টুপি পরা, নমাজ পড়া বাধ্যতামূলক করবেন।

কয়েকদিন আগে ধর্মতলায় মুসলমানদের সমাবেশে দিদি যা ভাষণ দিলেন তা শুনে মনে হলো পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বলে কোনও পদার্থ নেই। মমতা ব্যানার্জী বলছেন— না মমতাজ বেগম বলছেন বুঝতে কষ্ট হয়। আজ পর্যন্ত দিদি কি কোনও হিন্দু সমাবেশে গেছেন? বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অথবা আর এস এস এদের কোনও সম্মেলনে ডাকলে দিদি কি আসবেন? এ ভাবা দুঃস্বপ্ন। দিদি সহজেই মাথায় টুপি লাগিয়ে হাত তুলে মুসলমানী সাজতে পারেন— কিন্তু কিছুতেই কখনও হিন্দু সাজেন না। লোকসভার ভিতরে যেমন খুশী তেমন সাজো প্রতিযোগিতা হয় না। না হলে দিদির প্রথম পুরস্কার বাঁধা ছিল। নিশ্চিত পেতেন।

দিদি আসছেন। দিদি যে শুধু দু'দল বিড়ালকে নিয়ে আসছেন তা নয়। সঙ্গে একদল বিশ্বস্ত স্তাবকও আছে। বুদ্ধিজীবিরূপী এই স্তাবকেরও প্রভুভক্তিতে অটল। এদের প্রভুভক্তি এতটাই অটল অচল যে আমার আপনার বাড়ির যে কোনও প্রজাতির সারমেয়দের অবশ্য হার মানাবে। এতদিন আমার আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েরা জানতো সবচেয়ে প্রভুভক্ত হলো সারমেয়। দিদির দাক্ষিণে তাদের সে আসন টলোমলো। কারণ কলকাতার কিছু বুদ্ধিজীবী। দিদি কৃপায় এরা প্রসাদ পাচ্ছেন এক টুকরো মাংসের মতো রেলের একটা পদ। আর কি চাই। পদলেহন ও চাটুকারিতা চলছে। আগেকার রাজাদের ভাঁড় থাকতো শুনেছি। এখন দিদির চারপাশে বিশ্বস্ত বুদ্ধিজীবীরা আছে। এদের সঙ্গী করেই দিদি আসছেন। আসছেনই।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

বিশাখা বিশ্বাস

রোম পুড়ছিল, নীরো বাঁশী বাজাচ্ছিলেন। নেতাই গ্রামে রক্তের নদীতে লাস ভেসে চলছিল, বুদ্ধের নয়া বঙ্গজ-অবতার সবলা মেলায় সানাই শুনছিলেন। জ্বলন্ত বাংলার আর্তি নিয়ে এইভাবে ছিনিমিনি খেলার পর অবশেষে লালগড় গণহত্যার ত্রিশ ঘণ্টা পরে বাংলার তথাগতজী আবার বলেছেন, ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক, 'এমনটি না হলেই ভালো হোত।'

অথচ, যা 'না হলে ভালো হোত' তা একবার নয়, এর আগে নন্দীগ্রামে একবার এবং তারও আগে সিঙ্গুরে আরেকবার হয়েছে এবং প্রত্যেক বারই মায়াকেভিস্কি দর্শনের ভগীরথটি বলেছেন, 'এমনটি না

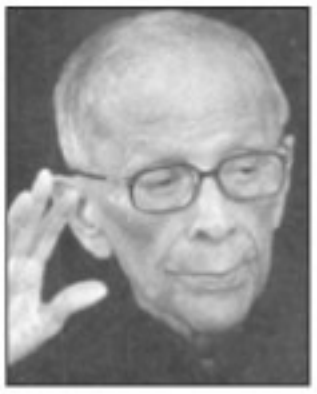

হলেই ভালো হতো'। এরই নাম মার্ক্সবাদী বিজ্ঞান কেননা এই বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই একদিকে রয়েছে চৌত্রিশ বছরের হাইটেক বিল্ডিং খুনে, ধর্ষণে শ্রেণীশত্রুর নিপাতকরণের ইতিহাস। অন্যদিকে রয়েছে মানুষের রক্তের বন্যায় কপট মানবতার ভেলায় চেপে 'ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক' বলে মনুষ্যত্বের প্রতি নির্মম পরিহাস। পরিহাস এই জন্যে যে, সেই 'দুর্ভাগ্যজনক' ঘটনা ঘটার পরেই আবার ভাড়াটে হার্মাদের পাদমূলে বসে লাল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ককে ভাবতে হয়ঃ আমাদের "অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু।" অস্যার্থ ঃ কাঠালবেড়িয়ায় ভগবান বুদ্ধের সভাভঙ্গের বারো ঘণ্টার মধ্যেই মৃতদেহ পাওয়া গেল বিপ্রদাস বৈরাগীর, গুলিবিদ্ধ হলেন বাসন্তীর পঞ্চায়েত সমিতির তিনবারের সদস্য কংগ্রেসের আবদুস সামাদ মণ্ডল! পূর্বপাকিস্তান হিন্দু উৎখাতে তৈরি করেছিল রাজাকার বাহিনী, ইরানের শাহ্ প্রতিবাদী মানুষের রক্ত নিতে তৈরি করেছিলেন গুপ্তঘাতক বাহিনী, চিলির শাসকেরা তৈরি করেছিল ঘাতকবাহিনী কডোক, শ্বেতশুভ্র বহিরাঙ্গবাস নিয়ে বুদ্ধ তৈরি করেছেন হার্মাদ। নন্দীগ্রামে এই হার্মাদদের অত্যাচার দেখেই প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী বলেছিলেন "হাড় হিম করা সন্ত্রাস।" এই হার্মাদদের নেতাই গ্রামের গণহত্যার পর বর্তমান রাজ্যপাল এম. কে. নারায়ণণ বলেছেন "আজকের দিন বড় দুঃখের, বড় লজ্জার"। এই হার্মাদদের 'হার্মাদ' বলে চিঠি লেখায় বুদ্ধের গোঁসায় চিদাম্বরম বলেছেন, "হার্মাদদের হার্মাদ না বলে অন্য কী নামে বলা যায় বাংলার বুদ্ধিজীবীদের কাছে সেই প্রতিশব্দ চাই।" এই হার্মাদেরা লালগড় থেকে সরে এসে সমগ্র আরামবাগে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এই হার্মাদেরা নানুর থানার দশটি গ্রামে ক্যাম্প খুলে বসেছে। শোনা যাচ্ছে এই রকম হার্মাদেরাই গত চৌত্রিশ বছর ধরে মার্ক্সবাদকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে বঙ্গেশ্বর বুদ্ধকে বিশ্বপুঁজির দালালীর শিরোপা পরিয়েছে। নতুবা যিনি একদিন চোরেদের ক্যাবিনেট ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন, তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এসে তিনি সেই ক্যাবিনেটেই কেমন করে জমি ডাকাতির সর্দার হলেন, বৃদ্ধ শাজাহানকে ইন্দিরা ভবনে বন্দী করে কেমন করে তিনি অত্যাচারী আলমগিরে পরিণত হলেন?

সেই বজ্জাত জালিম ধূর্ত ভণ্ড শয়তান বঙ্গেশ্বর ক্ষমতালোলুপ সেই বদনসিব বুদ্ধ, বিগত নির্বাচনগুলিতে সেই বাতিল পৌরুষ, হাতে রক্ত, বুকে দম্ভ, মুখে বিনয় নিয়ে যখন বলেন হয় 'বামফ্রন্ট নয় মৃত্যু', বিমান বোস যখন বলেন এবারে 'ঘটি ঘটি রক্ত দিতে হবে' এবং যখন সুশান্ত ঘোষ বলেন 'ড্রেন দিয়ে রক্ত বইয়ে দেওয়া হবে'— তখন হার্মাদদের হাতে পড়ে বিপর্যস্ত আর্ত মানুষ ভয়ে-বিস্ময়ে চমকে উঠে ভয়ার্ত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে 'আই ফেল অন্ দ্য থর্নস্ অব লাইফ— আই ব্লিড— জীবনের কাঁটার ওপর পড়ে আমি রক্ত দিয়ে গেলাম!

জীবনের কাঁটার ঝোঁপে পড়ে রক্তের বিনিময়ে মৃত্যুকে যারা জয় করেছে, তাদের মৃত্যুকে উপহাস করে নন্দীগ্রাম গণহত্যার দিন রাইটার্সের ঠাণ্ডা ঘরে বসে হাসিমুখে যারা সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন, ছয় মাসের জেল হাজতের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এক আমলা যিনি জামিন নিয়ে ভিজিলেন্স কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছেন, ছত্রধর মাহাতোর কোটি কোটি টাকার পাশ বইয়ের গল্প, যিনি বারেবারে শুনিয়েছেন— তাদের, সেইসব কর্তাভজা আমলা-পুলিশের মুখ আমরা চিনি। কিন্তু আমরা দেখিনি সেইসব মুখ যে জানোয়ারেরা কিশোরী তাপসীকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল, যারা চটি পরে নন্দীগ্রামে মা-বোনের ইজ্জৎ-হানি ঘটিয়েছিল, যারা লালগড়ে কুমারী মেয়ের বুক টিপে নক্সাল-মাওবাদীদের পরিচয় জানতে চেয়েছিল। তাই ইদানিং গৌতম দেব বলেছেন, মার্ক্সবাদীরা আয়নায় আপন আপন মুখখানা দেখুন— আত্মসমালোচনা করুন। গৌতম দেবকে কোনও সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেননি, আয়নায় সবাই কী সব মুখ দেখতে পায়? ধর্মতলায় এস. ইউ. সির যুবকর্মীকে প্রকাশ্যে গুলি করে মারার পর কমরেড জ্যোতি বসু যেদিন বলেছিলেন "আন্দোলনটা নিরামিষ হয়ে যাচ্ছে দেখে একটুকু আমিষ করে নেওয়া হলো"— জীবনের কাঁটায় রক্তকে সেই উপহাসিত মানুষটি কী কোন আয়নায় তার মুখে যন্ত্রণার ছাপটি সেদিন দেখতে পেয়েছিল? কিম্বা, ধর্মতলাতেই এগারো জন যুবকংগ্রেস কর্মীকে গুলি করে মারার পর জ্যোতি বসুই যেদিন বলেছিলেন 'ওরা পুলিশকে আক্রমণ করেছিল'— সেই এগারো জন হতভাগ্য যুবক মৃত্যুর আগে সেদিন কী আয়নায় তাদের মুখে পুলিশকে আক্রমণ করার কোনও প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিল? অথবা, 'অমন তো কতই হয়' বলে বানতলায় সেই ধর্ষিতা এবং নিহত অমিতা দেওয়ানদের অপমান করার পরেও জ্যোতি বসু কী তার মুখে আয়নাতেও কোনও দম্ভের লেশমাত্র দেখতে পেয়েছিলেন? নয়ত বা, বিরাটীর সেই হতভাগিনী সতেরো জন যুবতীকে সিপিএম-এর হার্মাদেরা গণধর্ষণ-কর্মটি সুসম্পন্ন করার পর শ্যামলী গুপ্তও কি 'মেয়েগুলোর চরিত্র ভালো ছিল না' বলার পর আয়নায় তার নিজের মুখের চেহারাটা দেখতে পেয়েছিলেন? আসলে, নিজের নিজের মুখ আয়নায় কেউ দ্যাখে না, দেখতেও পায় না। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষেরা সকলের সব মুখই দেখি, সব মুখই দেখতে পাই। আমরা দেখেছি বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারীর সেই 'ট্র্যাজিক স্যাকরিফাইস' (বিয়োগান্তক সেই বলি) যতীন চক্রবর্তীর যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখ, মাটি কেলেঙ্কারীর নায়ক সেই প্রশান্ত সুরের নিষ্পাপ মুখ, "এই সরকার ঠিকেদারদের হলে উনি মন্ত্রিসভায় আছেন কেন" বলে উপহাসিত বিনয় চৌধুরীর সেই বেদনার্ত মুখ এবং সেই সাথে সাতশ টাকার বেতনের কর্মচারীর শিল্পপতি হওয়া চন্দন বসুর সেই মুখ, এন ডি এ সরকারকে বর্বর বলার পর আদিম সমাজের সেই জঙ্গলী বর্বরদের মুখ এবং সর্বশেষে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-নেতাই গ্রামের বর্বরতার সর্বশেষের নায়ক সংস্কৃতি এবং সরস্বতীর বরপুত্র শ্বেতবাসে ভূষিত সেই ধূর্ত খলনায়ক ভণ্ড ভগবান বুদ্ধের গলিত মাংসল একখানি মুখ— আমরা সব মুখ-ই দেখি, 'বাংলার (সব) মুখই আমরা দেখেছি'।

Swastika
21 February - 2011, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

সামাজিক সহমর্মিতার এক মিলন প্রবাহ নর্মদা কুম্ভ

মাণ্ডলা থেকে নবকুমার ভট্টাচার্য।। প্রথম দেখাতেই মনে হলো যেন প্রয়াগের কুম্ভে পৌঁছে গিয়েছি। সেই সারি সারি তাঁবুর শিবির, বিরামহীন জনস্রোত, অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী, নিরন্তর কীর্তন-ভজন, মাঝেমধ্যেই মাইকে নানা ঘোষণা— আর মা গঙ্গার মতো এখানেও প্রবাহমান শিবকন্যা নর্মদা। সব মিলিয়ে যেন প্রয়াগ কুম্ভের একটি নবীন সংস্করণ। তবে মোক্ষলাভ নয়, সামাজিক সহমর্মিতাই এই কুম্ভের লক্ষ্য। বিগত দুই দশক জুড়ে আতঙ্কবাদ এবং নকশালবাদী হামলায় ভারতীয় সংস্কৃতি বিপন্ন। ভেদাভেদ এবং জাতপাতের কুসংস্কার থেকে এখনও আমাদের মুক্তি মেলেনি। আজ নানা ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদেশী শক্তি দেশকে টুকরো টুকরো করতে উদ্যত। এইসব নানা ঘটনায় দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং সামাজিক সংগঠন চিন্তিত। এই চিন্তার ফলশ্রুতিই মা নর্মদা সামাজিক কুম্ভ। কুম্ভ যা শ্রেণী বর্ণ জাতপাতের ভেদ মিটিয়ে দিয়ে সামাজিক সহমর্মিতা তথা সমরসতাকে প্রতিষ্ঠা করে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই গত ১০ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডলাতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মা নর্মদা সামাজিক কুম্ভ। এই নর্মদাতে মিলিত হয়েছে ৮৮টি নদী, লীন হয়েছে ৮০০টি নালা। মানব সংস্কৃতির পোষণ তথা সংবর্ধনে নর্মদার অবদান অতুলনীয়। গত ১০ ফেব্রুয়ারি শুরুতে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী মণ্ডপে এক ধর্মসম্মেলনে ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। তাঁর মতে সমাজ জাগরিত না হলে ভেদাভেদ কাটবে না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। দ্বিতীয়দিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সাধু-সন্তের শাহী-স্নানের মাধ্যমে। এদিনের ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, খৃস্টান এবং ইসলামের উৎপত্তি হিন্দুধর্ম থেকেই। তাঁর মতে, বিশ্বের প্রতিটি মানুষ হিন্দু হয়েই জন্মায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাধ্বী ঋতম্ভরা। তিনি বলেন, মাতৃশক্তি জাগরিত না হলে সমাজ রক্ষা হবে না।

পাঞ্জাবের স্বাস্থ্যমন্ত্রী লক্ষীকান্তা চাওলা, গুজরাটের বিধায়ক স্বামী শম্ভুনাথ মহারাজ, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রমীলা তাইমেঢ়ে, শুকদেবানন্দ মহারাজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের অন্তিম দিনে ধর্মসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য, বাসুদেবানন্দ সরস্বতী মহারাজ, আর এস এসের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সভাপতি জগদেবরাম ওঁরাও, সাংসদ নভোজ্যোৎ সিং সিধু, রমন সিং, আশারাম বাপু প্রমুখ। বাসুদেবানন্দ সরস্বতী মহারাজ সকলকে হনুমান চাল্লিশা পাঠ করান। তিনদিনের এই কুম্ভমেলায় ১৫ লক্ষের ওপর লোক উপস্থিত ছিলেন।

নর্মদা কুম্ভে শাহী স্নান।

শহীদ মিনারে জনপ্লাবন

প্রকাশিত হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি, '১১
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি, '১১

সংস্কৃত ও সংস্কৃতি

প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বর্তমান ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই একটি সুসভ্য সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। সংস্কৃত না জানলে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধারাগুলি জানা সম্ভব নয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ব্রাত্য। এই রাজ্যে মাদ্রাসার জন্য রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করা হলেও টোলগুলি অবহেলিত। যদিও সংস্কৃত না জানলে বাংলাভাষা চর্চা সম্ভব নয়, ভালো কম্পিউটার জানতে গেলেও এখন সংস্কৃতের প্রয়োজন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্বসংস্কৃত পুস্তকমেলা। পশ্চিমবঙ্গে 'সংস্কৃত ভারতী'র কাজ। এসব তথ্য নিয়েই বিশেষ বিষয়— সংস্কৃত ও সংস্কৃতি।

।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ পাঁচ টাকা।।
আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কপি বুক করুন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রথেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com